হাসির আড়ালে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সৃষ্টি প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯

প্রচ্ছদ
দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক
অমল সাহা

সৃষ্টি প্রকাশন
বি বি ১০২, ভি আই পি পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অক্ষরবিন্যাস
সৃষ্টি প্রকাশন

মুদ্রণ
ইমেজ আইডিয়াল প্রিন্টার্স
১০৫/৩৮/১, নিউ পঞ্চাননতলা রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৪১

পরম শ্রদ্ধাভাজন
স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজীকে

সূচিপত্র

হাসির আড়ালে	৯
তোমাদেরই মতো গৃহী একজন	১৫
দিশি রিলেটিভিটি	১৯
পৃথিবীতে যত বেটা সব বেটা গরু	২৩
ব্যর্থ হবে বফর্স	২৮
জ্ঞানদা, মোক্ষদা	৩৩
উড়বে সাধের ময়না	৩৯
লাস্ট ল্যাং	৪৩
ধর্ম ও লিভার	৪৮
অভিমান	৫৩
পলায়ন নয় সম্মুখ সমর	৫৮
অতিক্রান্ত শতবর্ষে	৬৩
হায় বাবা মানুষ !	৬৯
ভাল আচি ভাই	৭৪
সকালে উঠিয়া আমি	৭৮
ছাই	৮১
ঋতুরাজ গ্রীষ্ম	১০২
ধর্মের আলো	১১৮
চীনে গল্প	১২৫
শামুক না শঙ্খ	১৩১

লেখকের অন্যান্য বই

গাঙচিল
কিচির মিচির
সাপে আর নেউলে
রাত বারোটা
কাটলেট
হেড স্যারের কাণ্ড
বড়মামার কীর্তি
বাঘমারি
থ্রি এক্স
সপ্তকাণ্ড
সাত টাকা বার আনা
হাসিকান্না চুনি পান্না
পুরনো সেই দিনের কথা
গাধা
সুখ ১ম
সুখ ২য়
সুখ ৩য়
গৃহসুখ
আন্দামান ঃ ভারতের শেষ ভূখণ্ড
শ্রীচরণকমলে
কিশোর রচনাসম্ভার ১ম, ২য়
দাদুর কীর্তি
বাঙালী বাবু
উৎপাতের ধন চিৎপাতে

হাসির আড়ালে

সাহিত্যের শ্রেণীবিচারে হাসি আর কান্না, এই বিভাজন বড় মোটা দাগের। সাহিত্য হল জীবন। জীবন থেকে উত্থিত। জীবন দুপায়ে চলে, একপা হল, আনন্দ, উচ্ছ্বাস, হাসি, চপলতা। অন্য পা হল, দুঃখ, বঞ্চনা, বেদনা, বিচ্ছেদ, মৃত্যু! আলো আর অন্ধকার এই হল জীবন। কখনো আলো ছায়া। একটা দিনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত্রি। আবার ঋতুচক্রের উপমাও আনা যায়, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। জীবন এইরকম একটা মিশ্রণ। রুল টানা কাগজের মতো। একটু হাসি, একটু কান্না। এক ছটাক প্রেম, আধপো বিরহ। আজ যার হাত ধরে ফুলের বাগানে বেড়াচ্ছি, কাল সে হয়তো হাত ছেড়ে চলে যাবে। সকালে যে হাহা করে হাসছে রাতে সে হয়তো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে।

একটা হাসির উপন্যাস লিখুন, এমন ফরমায়েস রাখা এক অসম্ভব ব্যাপার। একটা জীবন শুধু হাসি আর হাসির মধ্যে দিয়ে গোটা একটা উপন্যাসের পরিসরে হেঁটে চলেছে, তা কি কখনো হয়! অথবা একের পর এক চরিত্র আসছে আর পাঠককে হাসিতে লুটোপুটি খাইয়ে চলে যাচ্ছে, তা কি সম্ভব! সম্ভব হলেও সে হাসি কেমন হবে! একজন মানুষকে চিৎ করে ফেলে অনন্ত কাতুকাতু দিলে, তিনি আর হাসবেন না, কাঁদবেন।

বরং বলা যেতে পারে, আপনি একটা উপন্যাস লিখুন! স্বাভাবিক জীবনের কাহিনী। মানুষের বেঁচে থাকার কাহিনী। সেই সব চরিত্র আনুন যাদের আমরা চিনি। কাহিনীর জালে আমাদের জড়িয়ে ফেলুন। লেখক হল বাঁশির ফুটোর মতো। সাতটা সুরের খেলা। জীবন ফুঁ দেবে, বাঁশির ফুটো দিয়ে বাতাস বেরোবে। লেখকের মেজাজ, মনের ছাঁচের ঢালাই অনুসারে কাহিনীর রূপ ফুটবে। রোমান্টিক ছিদ্র দিয়ে আসবে গোলাপী জীবন কাহিনী, প্রেমের ধারাপাত। পোড় খাওয়া বাস্তববাদী মন মানুষের ক্ষত-বিক্ষত জীবনের কথা বলবেন। জীবনের গোটা ব্যাপারটাকে কেউ

দেখবেন লাগাতার একটা তামাশা। নাথিং সিরিয়াস, অল ফান। কিছুই যখন থাকবে না, কিছুই যখন যাবে না সঙ্গে, তখন এই কামড়া-কামড়ি, আঁচড়া-আঁচড়ির কি মানে! জীবনকে যারা পাগলের মতো ভাল্লুকের মতো, জড়িয়ে ধরতে চায় তারা বোকা। দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, শেক্সপিয়ার আর বারনার্ড শ। দু'জনের দুই মানসিকতা। দু'জনেই একই জীবন দেখছেন। দেখার ধরন কত আলাদা। একেই বলে সাহিত্যের মেন্টাল অ্যালকেমি। শেক্সপিয়ার দার্শনিক। শ স্যাটায়ারিস্ট, হিউমারিস্ট। শেক্সপিয়ার দেখছেন এই ভাবে :

And so from hour to hour we ripe and ripe
And then from hour to hour we rot and rot
And thereby hangs a tale.

অনেকটা আমাদের বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যের মতো। জীবনকে তিনি যে-ভাবে পরিণতির দিকে যেতে দেখেছেন, তা হল।

(অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতংতুণ্ডম।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপিণ্ডম॥)

from hour to hour we ripe and ripe এই হল জীবন দর্শন।

দার্শনিক মন জীবনের সত্য এই ভাবেই আত্মস্থ করেন ; যাঁরা হিউমারিস্ট যেমন বারনার্ড শ, তিনি জীবনকে দেখছেন অন্য চোখে—

Life is no brief candle to me. It is a
sort of splendid torch which I have
got hold of for the moment and I want
to make it burn as brightly as possible
before handing it on to future generations.

একই জীবন, যে যে ভাবে দেখবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, জীবন একটা খেলা, ইট ইজ এ প্লে ; কিন্তু হোয়েন প্লে বিকামস এ টাস্ক, তখন খেলা আর খেলা থাকে না, মানুষ আষ্টেপৃষ্ঠে সেঁটে যায় জীবনের সঙ্গে, তখনই দুঃখ। কামনা, বাসনা, লোভ সব এক সঙ্গে ঘাড়ে চেপে বসে। রবীন্দ্রনাথ শা-জাহানকে উদ্দেশ করে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, তা এক মহাসত্য : কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান। তবু, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। একটা দার্শনিক সত্তা নিয়ে

জীবনের মধ্যে থেকে জীবনকে উপভোগ করতে চাই। লংফেলোর মতো বলতে চাই,

Life is real! Life is carnest!
And the grave is not its goal;
Dust thou art, to dust returnest
Was not spoken of the soul.

জীবনের এই দর্শনে হাসি আছে, তামাশা আছে পরোটার মতো পরতে পরতে। মাটির স্তরে অভ্রের ঝিলিকের মতো। আগুনের লিকলিকে শিখার মতো ক্রোধ আছে। ইলেকট্রিক ওয়্যারিং-এর শর্ট সারকিটে যেমন চিড়চিড়ে আগুন জিভ বের করে, সেই রকম আমাদের নার্ভাস সিস্টেম সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রে জ্বলতে থাক। মানুষের চরিত্রের অসঙ্গতি দেখে আমাদের ঠোঁটে যে হাসি ফোটে, সেটা হাসির হাসি নয়, ক্ষোভের হাসি। একটি ছেলেকে হতাশ হয়ে তার পিতা যখন বলেন, 'তোমার আর কিছু হবে না, ইউ আর ফিনিশড্', তখন তিন এক ধরনের হাসি মেশাতে পারেন, সে হাসির চরিত্র হল সন্তানকে ঘিরে পিতার যে স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাওয়ার শূন্যতা। গিরিশবাবু প্রফুল্ল নাটকের শেষ দৃশ্যে- 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলেছিলেন হাসতে হাসতে। সে-হাসি কান্নার চেয়েও ভয়ঙ্কর। সকালে বাজার থেকে বেরিয়ে এসে যখন কেউ অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলেন, 'বার্নল আছে?'

'কেন, কি হল?'

'আঙুলে ফোস্কা পড়ে গেল ভাই। আলু, পটল, বেগুন, ঢেঁড়স সব যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো।'

উত্তর শুনে প্রশ্নকারী হেসে উঠতে পারেন। এ হাসি আনন্দের হাসি নয়। হিউমার অফ লাইফ। সর্বাঙ্গীণ এক সর্বনাশের চিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় মানুষের সমর্পণের হাসি। এই মনের যে ক্রোধ তা বেরিয়ে আসতে পারে 'স্যাটায়ার' হয়ে। যেমন, কলকাতার বিকল টেলিফোন ব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে, টেলিফোনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়েছিল। তির্যক মজা। ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রতিবাদ। সমস্ত পরিকাঠামো যখন ভেঙে পড়ে তখন একদল মানুষ বিক্ষোভে ভাঙ-চুর করে, আর একদল করেন স্যাটায়ার, জ্ঞানী হয়ে যান দার্শনিক, ফিরে তাকান ইতিহাসের দিকে, প্রবহমান মহাকালের দিকে। ক্ষমতার পদলেহন ছাড়া

সাধারণের বাঁচার পথ কবেই বা খোলা ছিল! গালিব দুটি পথ দেখিয়েছেন,

'গালিব বাজিফাখ্ বার হো, দো শাহ কো দু আ।
বো দিন গায়ে কি কহতে থে নৌকর নহী হূঁ মৈ॥'

গালিব, তুমি বেতনভোগী, বাদশাহের জয়ধ্বনি তোলো। সেদিন গেছে যেদিন তুমি বলতে আমি কারো চাকর নই। দাসত্ব থেকে মুক্তি কোথায়! অর্থাৎ মোসায়েবী কর। একালের ভাষায়, চামচা হয়ে যাও। ভেতরটা খুব ছোট হয়ে যাবে। সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে। আত্মপুরুষের কান্না শুনতে পাওয়া যাবে; কিন্তু উপায় নেই।

মানুষের এই অবস্থা দেখে তুলসীদাস বলছেন,

তুলসী ইয়ে সংসারমে, কাহাঁসে ভক্তি ভেট।
তিন বাতসে লট্‌পাট হেয়, দাম্‌ড়ি চাম্‌ড়ি পেট॥

ধন, শিশ্ন আর জঠর, এই তিন চিন্তাতেই জীবন গেল, ভক্তিভাব আসবে কোথা থেকে! তুলসীর এই দোঁহা চাবুকের মতো। এর নাম শ্লেষ। জৈব চিন্তা থাকলে দাসত্বই জীবের অনিবার্য পরিণতি। তুলসীদাস আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। বললেন,

উদর ভরণকে কারণে, প্রাণী ন করতয়ি লাজ।
নাচে বাচে রণ ভিরৈ, বাচে ন কাজ অকাজ॥

উদরের জন্যে লাজ-লজ্জা বিসর্জন। কেউ সভায় নাচছে; কেউ ভয়ঙ্কর নদীতে বাইচ খেলছে। কারো শরীরে বল নেই তবু সে যুদ্ধে যাচ্ছে। কাজ, অকাজের বাছ-বিচার নেই।

জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে জ্ঞানী মানুষের সত্য আবিষ্কার ও সেই কঠিন বাস্তবকে সাহিত্যের মোড়কে মুড়ে মানুষের দিকে ছুড়ে দেওয়া। ভুক্তভোগী সেই দর্শন থেকে আনন্দের উপাদান খুঁজে পাচ্ছেন। নিজের অবস্থা উপলব্ধির আধ্যাত্মিক আনন্দ। এই হল মানুষের ইন্টেলেক্ট। এর পাশেই জীবনের সঙ্গে একটা রফায় আসার আনন্দ। চলে এসো দুঃখ। তোমার সঙ্গে হাত মেলাই; কারণ,

সুখমে বাজ পঁড় দুখকে বলিহারি যাই।
অ্যায়সে দুখ আওয়ে যো, ঘড়ীঘড়ী হরিনাম সোঁরাই॥

সুখে আমার বাজ পড়ুক; কারণ সুখ আমাকে আত্মবিস্মৃত করবে। ভোগী করবে। আমার অনুভূতি ভোঁতা করে দেবে। দুঃখ আসুক। দুঃখই আমাকে উত্তরণের পথ দেখাবে। গালিব আর তুলসী দুজনেই

একই রকম মনের অধিকারী। গালিব বলছেন,

রনজ সে খুগর হুয়া ইনসান তো মিটজাত হৈ রনজ।
মুশকিলে ইতনি পড়ী মুঝপর কি আসান হোগয়ী॥

দুঃখে রপ্ত হলেই মানুষের আর দুঃখবোধ থাকে না। ভীষণ মুশকিলে পড়েছি তাই সমাধানও মিলছে।

সাধু সেন্ট লরেন্স-এরও সেই এক কথা— দুঃখ যদি তিনি দেন, দুঃখ সহ্য করার শক্তিও তিনি দেবেন। ভক্ত মানুষের সাহিত্যে এক ধরনের অভিমান থাকে। নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন চলে। যেমন রামপ্রসাদ। তাঁর গীত অভিমানীর মন দিয়ে লেখা। মায়ের কাছে ছেলের অভিমান। একটি গানে লিখছেন রামপ্রসাদ,

করুণাময়ী! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা)
আমার এম্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ॥

কিছু পরেই রামপ্রসাদ হিউমারিস্ট। লিখছেন,

মা গো, আমি কি তোর পাকা খেতে দিয়েছিলাম মই॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, আমার কপাল বুঝি অম্নিঅই।
ওমা আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী॥

এক পাগলের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। সে পাগল যেদিন অনাহারে থাকত সেদিন বলত 'ভগবানের যেমন বরাত, ভোমলার আজ কিছুই জুটল না।' যেমন রামপ্রসাদ লিখেছেন—আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী। কত প্রচ্ছন্ন বৈদান্তিক এই দেশে বিচরণ করছেন।

এত কথার সার কথা হল, আমাদের জীবনের দেশলাইয়ের সঙ্গে মনের বারুদ-কাঠির সঙ্ঘর্ষে যে আগুন জ্বলে, সে-আগুন ত্যাগের ভোগের নয়। ভোগ একটা আছে, সেটা দুর্ভোগ। এ-দেশ ভোগের দেশ নয়। দুঃখ, কান্না, যন্ত্রণা, বঞ্চনা, অসীম দারিদ্র্য এই মাটিতেই মিশে আছে চিকচিকে চোখের জল, ফিনফিনে হাসি। মোটা দাগের হাসি নয়। সূক্ষ্ম হাসি, ব্যঙ্গের হাসি, বিদ্রূপের হাসি। মানুষের চরিত্রের যাবতীয় অসঙ্গতিকে একটু দূর থেকে রসিকতার চাবুক মারা।

বঙ্কিম থেকে ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ থেকে পরশুরাম যে ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে, সে ধারার উৎস হল বাঙালির ইন্টেলেক্ট। ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা, ভিক্টোরিয়ান আদর্শের ছোঁয়া, ইংরেজি শিক্ষা

তৈরি করেছিল একটা মানসিকতা। একদিকে ঘৃণা, একদিকে শ্রদ্ধা ; স্বাজাত্যভিমান, তার সঙ্গে হীনম্মন্যতা মিশে তৈরি হল মধ্যবিত্ত মেধা। একদিকে সংস্কৃত অন্যদিকে ইংরেজি, একদিকে গ্রাম্যতা, কুসংস্কার অন্যদিকে ইংরেজের শহুরে সভ্যতা, গতি, প্রগতি, মানবিকতা, উদারতা, এর মাঝে বাঙালি কলমের যৌথ দায়িত্ব। যে দায়িত্বের একটি হল মনোরঞ্জন নয়, মনোবিশ্লেষণ, মেধার ছুরি চালিয়ে নীচতা, হীনতা, কুসংস্কারের ডালপালা কর্তন। ভাগ্য বিশ্বাস থেকে পুরুষকারে বিশ্বাসী করে তোলা। এই প্রবাহে সবচেয়ে বড় ; অতি প্রবল তরঙ্গ তুলেছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন কেশবচন্দ্র ; জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। গোপালের ভাঁড়ামি, অসংখ্য জমিদার-মোসায়েবদের অসভ্য রসিকতার পঙ্ককুণ্ড থেকে বেরিয়ে এল-উইট, হিউমার, স্যাটায়ার। জেরোম কে জেরোম, ডিকেন্‌স, মার্কটোয়েন, বারনার্ড শ, একটু পরেই পার্কিনসন, সব মিলিয়ে একটা আদল। এই ধারায় আমদের কেদারনাথ, বিভূতিভূষণ, শিব্রাম। কিন্তু ? ইদানীং ? জীবন চটকে হাসি তৈরি করতে গিয়ে তৈরি হচ্ছে শ্রাদ্ধের পিণ্ড ; কারণ হাসানো যায় না, হাসি পায়, হাসি আসে।

তোমাদেরই মতো গৃহী একজন

নির্জনে মাঝে মধ্যেই প্রশ্ন করি, হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ! আপনি কে? কেন এসেছিলেন আপনি? কী ছিল আপনার মন্ত্র? আপনার ধর্মটাই বা কী? আপনি জানতেন, চিরকাল বেশিরভাগ মানুষই ভগবান, ভগবান করেছে এবং করবেও, ভগবানকে না জেনে। কে ভগবান? হরেক রকমের উত্তর। বহুরকমের বিশ্বাস। সব উত্তরেরই মূল একটি সূত্র, জীবন থেকে পৃথক, কখনো যন্ত্রণাদায়ক, কখনো সুখদায়ক, কখনো রুষ্ট, কখনো শিষ্ট, ভয়ঙ্কর শক্তিশালী এমন একজন কেউ, যাঁর ঠিকানা আমরা কেউ জানি না, তাঁর অনেক রূপ। মানুষ তাঁকে মন্দিরে রাখে। তাঁকে পূজা করতে হয়। অজস্র সংস্কৃত মন্ত্র, ফুল, গঙ্গাজল, নৈবেদ্য। শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদে আরতি। সকাল এবং সন্ধ্যায় নিত্য এই প্রক্রিয়ার পর দুয়ার বন্ধ। এই পূজার দর্শক হয়তো দশ-কুড়ি জন। সবাই প্রবীণ প্রবীণা। কিশোর এবং যুবক ভগবানের তোয়াক্কা করে না। যদি কোনো কিশোর থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার পরীক্ষা এসে গেছে। যদি কোনো যুবক থাকে, বুঝতে হবে সে এখনো বেকার। আর এই পূজার অধিকারী কে? পুরোহিত। মন্ত্র, মুদ্রা, ষোড়শ উপচার সমন্বিত একটি যান্ত্রিক ক্রম। দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। সাধারণ মানুষ দর্শক মাত্র। স্পর্শের অধিকারী নয়। মানুষের ভগবান মানুষের সামান্য অপবিত্রতায় অপবিত্র হয়ে থাকেন। মানুষের ভগবান মানুষ থেকে দূরে, শাস্ত্র আর বিধিনিষেধের বেড়ায় ঘেরা। দরিদ্রের চরণামৃতে অধিকার, ধনী গর্ভমন্দিরের প্রসাদের অধিকারী তো বটেই, সেবাইতের দৃষ্টিতে তিনিই আসল ভগাবন। শ্বেত পাথর তাঁর। স্বর্ণ মুকুট তাঁর, ভোগ তাঁর, পঞ্চপ্রদীপ তাঁর, চূড়ার পতাকাটি তাঁর, তাঁরই শিবরাত্রি, তাঁরই দীপাবলী। মানুষের ভগাবানের কী বন্দীদশা!

তাহলে আরাধনা, তুমি কোথায়! জীবের আক্ষেপ, বিক্ষেপ, অভিযোগ, অভিমান কে শুনবে! সেই মুক্ত, উদার, স্বাধীন ভগবান, তুমি কোথায়!

বেড়ানো বাউলের গানে। পণ্ডিত সেই ভগবানকে পাত্তা দেবেন না। তাঁরা সারা জীবন বিচার করবেন, ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার। তিনি সগুণ অথবা নির্গুণ। তাঁরা বিচার করবেন, জগৎ আছে না নেই। স্বপ্ন না মায়া। কখনো আমি আর তুমি কখনো শুধুই আমি আমি, অহং ব্রহ্মাস্মি। বিচারের বিশাল আবর্তে ভগবান তলিয়ে গেলেন। আমি দিয়ে তুমিটাকে ধরতে গিয়ে তুমি আর আমি দুটোই গেল। ঠাকুরকে চিনেছি। নিঃসংশয়ে চিনেছি। তিনি এসেছিলেন স্বয়ং ভগবানকেই মুক্তি দিতে। মন্দির, মসজিদ, গির্জা থেকে মুক্তি দিতে। পণ্ডিত আর পুরোহিতদের হাত থেকে তাঁকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। এই কাজটি পূর্বে অন্য কোনো অবতার করেননি। তাঁরা প্রত্যেকেই একটি করে ধর্ম রেখে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কোনো বিশিষ্ট ধর্ম নেই। সব ধর্মই তাঁর ধর্ম। তিনি রেখে গেছেন স্নেহরসসিক্ত সহজ সরল একটি মাকে। তিনি যেমন বলেছিলেন চাঁদা মামা সকলেরই মামা।

পথ সম্পর্কে ধারণাটা তিনি সম্পূর্ণ অন্য রকম করে দিলেন। ভাবতে বসলে মনে হয় আনন্দে জড়িয়ে ধরি আমার ঠাকুরকে, তাতে তিনি যা ভাবেন ভাবুন। যত মত তত পথ'তো আছেই, এর চেয়ে অধিক আর একটি কথা আমি খুঁজে পেয়েছি। পথ ও পথিক, দুটি মাত্রা। পথ অচল, পথিক সচল। পথের একটা মন্তব্য থাকেই, তা না হলে পথিকের হাঁটাটাই থাকে না। আমি যাব বলেই তো পথ। একটা জীবনে অনন্তর পথ ধরে অমি কতটা যেতে পারি! এক ইঞ্চির ভগ্নেরও ভগ্নাংশ। তা হলে? কী হবে হেঁটে! যেখানে আছি সেইখানেই বসে বসে মরে যাই না কেন?

ঠাকুর বললেন, ঘাবড়াচ্ছিস কেন। পথও তো গুটিয়ে আসতে পারে। তুমি যেই এক পা যাবে। তিনি একশো পা এগিয়ে আসবেন, এই হল রেশিও। তোমার এক পা সমান তাঁর একশো পা। এদিকের যাত্রা শুরু হলেই ওদিকের যাত্রা শুরু হবে। জগতের পথ আর ধর্মের পথের এই তফাত। এপাশের আকর্ষণে ওই প্রান্ত কার্পেটের মতো গুটিয়ে আসবে! ঠাকুরই প্রথম বললেন, চলা নয় টান। তিনটি সাংঘাতিক আকর্ষণের সমাহারে তিনিই চলে আসবেন। তিন টান এক করো। ও কথা আছে থাক, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। জ্ঞানের পথ এমনই বটে। সে পথে যাওয়ার প্রয়োজন কী। তিনি তো তোমার পাশেই আছেন। তুমি শুধু একটু খেয়াল

করো। বরং উপনিষদের ওই কথাটি গ্রহণ করো উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত। মেদামারা হলে হবে না। রোখ চাই। আলকেটে আজই এখনি আমার ক্ষেতে জল আনব। তাঁর কৃপা ধারা। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য...

মন্দির, মসজিদ, শাস্ত্র, পুরাণ, থাক, সব থাক। খেলাটা তোমার সঙ্গে তোমার। অন্য কোন পথ নেই। ভক্তিই একমাত্র পথ। তুমি নিজের ভালবাসার কাঙাল, তিনিও যে তোমার ভালবাসার কাঙাল।

পৃথিবীকে কেন অস্বীকার করবে। প্রকৃত জ্ঞান হলে আজ যাকে স্বীকার করছ, কাল আপনিই তা অস্বীকার হয়ে যাবে। মারদাঙ্গার প্রয়োজন হবে না। শুকোলে সুপুরিগাছের বেল্লো আপনিই খসে যাবে বাবা! টানাটানি করতে হবে না। পায়রার গলার মটরের দানার মতো তোমার মনে সংসার গজ গজ করছে, আর মুখে বলছ বেদান্ত। বলছ, সর্বত্যাগী। আত্মায় আত্মহত্যা করে ফেলেছ, সাবধান! নিজেকে ঠকিয়ো না বাছা! ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে মিথ্যে বোলো না। কাঁর সঙ্গে চালাকি করছিস! তিনি যে অন্তর্যামী! মন আর মুখ এক কর শালা! তোর ঢ্যামনামি কেউ সহ্য করবে না। নিজেকে দেখো। পরীক্ষা করো, বাজাও। সংসার আছে ভেতরে? কামনা, বাসনা? চনচনে ক্ষিদে? যাও, খানিক সংসার করে এস। স্বদারা সহবাস, সে অনুমতিও রইল। তবে ভগবানকে পেতে হলে একটু শয়তানিও করতে হবে। কৌশলটা শেখো আমার কাছে। সংসারে থাকবে, কিন্তু সংসার তোমার মধ্যে থাকবে না। কী রকম জানো, একটা উপমা দিয়ে বলি, নৌকো জলে ভাসবে, নৌকোর মধ্যে জল ঢুকল সর্বনাশ। ডুবে যাবে। অভিনয় করবে, ভাবখানা দেখাবে, তোমার পরিবার পরিজন কত আপনার! তুমি ভেবে ভেবে সারা। মনে মনে জানবে, ওরাও তোমার কেউ নয়। তুমিও ওদের কেউ নও। মনে মনে গুন গুন করে গাইবে, ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়। পরিবারকে সোহাগ করবে, অবশ্যই করবে, তবে ঈশ্বরীয় কথা বলবে। আলু, পটল, লাউ, কুমড়ো, চন্দ্রহার, বালা, চুড়ির কথা নয়, পরচর্চা পরনিন্দা নয়। ধীরে, ধীরে, গড়ে পিটে তাকে করে তুলবে বিদ্যারূপিনী। নারীকে ঘৃণা নয়, উপেক্ষা নয়, অবদমন নয়, উপাসনা। নারী হলেন শক্তি, মহামায়া। দয়া করে তিনি পথ করে না দিলে তুমি বিশালাক্ষীর দ'য়ে মজবে। চটিও না,

রাগিও না। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। নিজে শিব হও, স্ত্রীকে করো শক্তি স্বরূপিনী পার্বতী। সংসারে ভোগী পুরুষরাই স্ত্রীকে ভোগের সামগ্রী ভেবে যত দুর্ভোগের কারণ হয়। সংযম শুধু ঈশ্বরের জন্যে নয় অর্থনীতির জন্যেও। অধিক সন্তান দারিদ্র্যের কারণ। খাওয়াবে কী? পরাবে কী? শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের কী হবে! আমি কঠোর করতে বলছি না। আমি বলছি দায়িত্বশীল হও। নিকৃষ্ট মানুষ না হয়ে প্রকৃষ্ট মানুষ হও। জগতটাকে পরতে পরতে চেনো। ধোঁকার টাটি। বিবেক হলদি গায়ে মাখো। দুটো তরোয়াল রাখ কাছে, জ্ঞান আর ভক্তি। এই গর্ব মনে রাখো — আমি রামকৃষ্ণের সন্তান।

প্রশ্ন করেছিলে। আমি কে? আমি তুমিই। তোমাদেরই একজন। দরিদ্রের সন্তান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার বর্জিত। অনিকেত। কপর্দক শূন্য। তোমাদেরই মতো গৃহী একজন। তফাত এই, আমি দুয়ার খুলতে পেরেছিলুম। জীবে শিব দর্শন করেছিলুম। হাটে হাঁড়ি ভেঙেছিলুম। তোমার পাওনা এবার বুঝে নিও।

দিশি রিলেটিভিটি

এই যে ছোকরা শোনো ?

-আজ্ঞে ! আমাকে বলছেন ?

-হ্যাঁ, তোমাকে। তুমি তো হরিশঙ্কর স্কুলে পড়তে ?

-আজ্ঞে হ্যাঁ।

-অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ড, হ্যারো, ইটন, নাম শুনেছ ?

-আজ্ঞে।

-হরিশঙ্কর থেকে গেলে কোথায় ? দিশিতে তো ! ওদিকে যাওনি তো !

-আজ্ঞে না।

-তাহলে ছোকরা অত জ্ঞান দিয়ে বেড়াও কেন ? কোন অধিকারে ? আইনস্টাইনের নাম শুনেছ ?

-শুনেছি।

-থিওরি অফ রিলেটিভিটি কাকে বলে জান ?

-ভাসা ভাসা জানি। এই আলো, গতি, স্থান, সময় সব মিলিয়ে, সময় এগোচ্ছে, না সময় পেছচ্ছে, না স্থির থাকছি, কে ভেসে যাচ্ছে, সময় না মানুষ, অতীতে যাচ্ছি না ভবিষ্যতে !

-চুপ, চুপ, ও হল বিলিতি রিলেটিভিটি, দিশি রিলেটিভিটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। সেটা আমার আবিষ্কার। ধৈর্য ধরে শোনো। শুনে অনুধাবন করার চেষ্টা করো। তুমি এক সময় ছেলে ছিলে ?

-এখনো তাই আছি।

-এখন আর তুমি ছেলে নও, ছেলের বাপ। চুপ করে শোনো, ফ্যাচোর ফ্যাচোর কোরো না। তুমি যখন ছেলে ছিলে তোমার বাপের সঙ্গে রিলেশান কেমন ছিল ?

-রিলেশান ?

-তোমাকে বলতে হবে না। আমি বলে দিচ্ছি, বাপ যেন সোঁদোর বনের বাঘ !

-ঠিক বলেছেন। ঠক ঠক করে কাঁপতুম। বড় হয়েও সেই একই অবস্থা। নিজের বউয়ের সঙ্গে দুটো কথা বলব বলে গঙ্গার ধারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতুম। একবার পুলিসে ধরলে। বড়বাবু সব শুনে চা খাইয়ে ছেড়ে দিলেন। এ কথাও বললেন, প্রয়োজন হলে আমরা লকআপে বসে গল্প করতে পারি, ওটা খালিই থাকে। সিমপ্যাথির কারণ, বড়বাবু সাহিত্যচর্চা করতেন। একটা উপন্যাস তখন লেখা হয়ে গেছে, জীবন মরণ।

-বেশ। এইবার সেই রিলেশানটা এখন কী দাঁড়িয়েছে! বাপ ছেলেকে দেখলে কাঁপে।

-আমার ছেলে আমার নাতির আতঙ্কে ট্র্যানসফার নিয়ে আন্দামানে পালিয়েছে।

-আর আপনি ?

-আমি বেশির ভাগ সময়টা রাস্তাতেই কাটাই। যখন আর পারি না গোয়ালে গিয়ে ঢুকি।

-তার কয়েকটা উৎপাতের নমুনা।

-শুনতে চাও, তাহলে শোনো। প্রথম হল, ঘরের মধ্যে ক্রিকেট। যেটাকে আমার ডাইনিং স্পেস বলি, সেইটা হল তার পিচ। সেই পিচে প্র্যাকটিস করে। জানলার কাচ, ছবি, ঘড়ি ওয়াশ বেসিন ভেঙে বাঙালির ঘর থেকে বেরোবে আর এক তেঙুলকর। সর্বক্ষণই প্র্যাকটিস চলছে। এরপর মাঝরাত, কখনো শেষরাত পর্যন্ত টিভিতে ক্রিকেট। থেকে থেকে চিৎকার চার, ছয়। এর ফাঁকে ফাঁকে আছে হাজার ওয়াটের মিউজিক সিস্টেমে ধাঁইধাপ্পড় গান। বাড়িতে ক্র্যাক দেখা দিয়েছে। যে কজন আছি আমরা কোনো রকমে খুঁটি গেড়ে, সকলেই প্রায় কালা।

-পড়াশোনা ?

-বই আছে, দামী স্কুল আছে, জাঁদরেল ইউনিফর্ম আছে, মাস্টার আছে। আছে সবই, পড়াটাই কেবল নেই।

-শাসন করেন না কেন ?

-কে করবে! তার আবার ইউনিয়ন আছে।

-মায়ের শাসন ?

-মায়ের ধারণা, হয় ছেলে শচীন হবে। না হয় কুমার শানু। আমি দুএকদিন মেজাজ দেখিয়েছিলুম, ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দিলে ওল্ড ফুল! যুগ অনেক এগিয়ে গেছে। সেই থেকে আমি চুপ।

হরিশঙ্করে তুমি আমার ছাত্র ছিলে ; মনে পড়ছে ? অবশ্যই মনে পড়বে। তোমাকে আমি কম পিটিয়েছি !

-সে তো আমাদের ভালর জন্যে।

-একালে উল্টে গেছে। সেকালে ছাত্ররা শিক্ষকদের দেখে কাঁপত, একালে শিক্ষকরা ছেলেদের দেখে কাঁপে। ভয়ে ক্লাসে যায় না। যারা পাস করতে চায় তাদের জন্যে কোচিং খুলেছে। তিন শিফ্‌টে মানুষ তৈরি হচ্ছে। সাজেসান, নোটস, ক্যারিয়ার, মানুষ, টাকা, ভোগ, দুর্ভোগ। মানুষ কোথায় ! খোল, খোলস সবই আছে, সাবান, সেন্ট, পমেটম, মানুষ নেই। ছিল মানুষের সভ্যতা, হয়ে গেল অমানুষের অসভ্যতা। সেইটাকেই বলা হচ্ছে চরম সভ্যতা। তাহলে কী পেলে, আলোর গতিতে এগোলে তুমি পেছবে। একেই বলে রিলেটিভিটি ! আরো আছে। রিলেটিভিটির উদাহরণ। আগে ছেলেরা মেয়েদের বিবাহ করত, এখন মেয়েরা ছেলেদের বিয়ে করে। একটা প্রেম মতো কি একটা হয়। দিন কতক খুব ছোটাছুটি। ফোনাফোনি, তারপর ফণা-ফণী। তিনি বধূ হলেন। ঢোকা মাত্রই ভুরুতে ভাঁজ। রুক্ষ দৃষ্টি। ক্লিয়ার আউট ক্লিয়ার আউট। এটা কে পরাশর ! তোমার বোন ? প্রেম নেই ! তাহলে পাত্রপাত্রী। বিদায় করো। এটা কে ? ভাই ! বেকার ! থেকে যাক। ফাই ফরমাশ। গ্যাস, বিল, বাজার। বুড়োটাকে কালই বৃদ্ধ নিবাসে। বুড়িটা থাক। রাঁধুনী কাম বেবি সিটার। যাও সকালের চাটা তুমিই করো। ভোরের দিকে আমার একটু প্রবলেম আছে। আর শোনো, সন্ধেবেলা আমার মাকে নিয়ে ডক্টর রায়ের চেম্বারে একটু যেয়ো, আর আমার বাবার জন্যে রাসটক্স-সিক্‌স গ্লোবিউলস এক ফাইল ভাল দোকান থেকে, লাইন দেখে ঘাবড়ে যেয়ো না। আমার ফিরতে আজ একটু দেরি হবে। রিহার্শাল আছে। এবারের নাটকটা সাংঘাতিক, ভীষণ ইন্টেলেকচুয়াল, মানুষের প্রতিরূপ, ক্লোনিং, টেস্ট টিউব বেবি সব আছে। তোমার মাকে বলো তো গরগরে আদা দিয়ে এক কাপ চা করে দিতে। গলার কাজ তো ! গলাটাকে ঠিক রাখতে হবে। বুড়ি বেঁকে ধনুক হয়ে গেছে, এখনো কি ফিট। ওই বয়েসে আমরা কি করব !

-মাস্টার মশাই এত ডিটেলস পেলেন কোথায় ?

-আমার বাক্স থেকে।

-বাক্স মানে ? পাণ্ডুলিপি !

-আরে না রে ! এক একটা পাড়া মানে বাক্সের পর বাক্স, বক্সের

ওপর বাক্স। তার ভেতরে মানুষ প্রাণী। ছানাপোনা, শান্তি-অশান্তি নিয়ে ফুঁসছে ফাঁসছে। মাঝে মাঝে চাপের চোটে ডালা খুলে যাচ্ছে। শোনো ছোকরা, রিলেটিভিটি আরো আছে। আগে পুলিস চোর ধরত এখন চোর পুলিস ধরে । রিলেটিভিটির সবচেয়ে বড় উদাহরণ, আমরা পাঁচশো টাকা আয়ে উপবাস করেছি, তোমরা পাঁচ হাজারেও উপবাসী। যাচ্ছ কোথায় ?

-আজ্ঞে ওর চটিটা মুচির দোকানে সারাতে দিয়েছিল। স্ট্র্যাপ। আনতে যাচ্ছি।

-আচ্ছা, আচ্ছা ! ও ! মানে বর্ণপরিচয় হল ওল। ঔষধ খেতে মিছে বলা !

'পৃথিবীতে যত বেটা সব বেটা গরু'

মানুষের উপকার করলে কী হয়! একে একে দেখা যাক। মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ সম্পর্কসূত্রে আমাদের আত্মীয়। বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন, দয়ার সাগর করুণাসাগর এমন উপকারী মানুষ দুর্লভ। রাস্তায় এক পাগলকে দেখে সবাই হাসছে মজা করছে, বিদ্যাসাগর মশাই কাঁদছেন। বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি ঘটনা অথবা কার্মাটারে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের একটি চিত্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি। হরপ্রসাদ তখন কার্মাটারে বিদ্যাসাগরের অতিথি।

"রৌদ্র উঠিতে না উঠিতেই একটা সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল 'ও বিদ্যাসাগর, আমার পাঁচগণ্ডা পয়সা নইলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা হইবে না; তুই আমার ভুট্টা-কটা নিয়ে আমায় পাঁচগণ্ডা পয়সা দে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়সা দিয়ো সেই ভুট্টাকটা লইলেন, ও নিজের হাতে তাকে তুলিয়া রাখিলেন। তারপর আর একজন সাঁওতাল - তার বাজরায় অনেক ভুট্টা; সে বলিল, 'আমার আটগণ্ডা পয়সা দরকার।' বিদ্যাসাগর মহাশয় আটগণ্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজারটি কিনিয়া লইলেন। আমি বলিলাম- 'বারে এ তো বড়ো আশ্চর্য! খরিদ্দার দর করে না- দর করে যে বেচে!' বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিলেন। তার পর দেখি, যে যত ভুট্টা আনিতেছে, আর যে যত দাম চাহিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দামে সেই ভুট্টাগুলি কিনিতেছেন আর তাকে রাখিতেছেন! আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক ভরিয়া গেল। অথচ ভুট্টা কেনার বিরাম নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম - 'এত ভুট্টা লইয়া আপনি কি করিবেন?' তিনি বলিলেন, 'দেখ্‌বি রে দেখ্‌বি।'

এর পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কী দেখলেন,

"বাংলায় (বাংলো) আসিয়া দেখি, বাংলার সম্মুখের উঠান সাঁওতালে ভরিয়া গিয়াছে—পুরুষ মেয়ে ছেলে বুড়ো—সবরকমের সাঁওতালই আছে। তারা দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে—কোনো দলে পাঁচজন, কোনো দলে

আটজন, কোনো দলে দশজন। প্রত্যেক দলের মাঝখানে কতকগুলো শুকনো পাতা ও কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল—'ও বিদ্যাসাগর আমাদের খাবার দে।' বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেশন করিতে বসিলেন। তাহারা সেই শুক্‌না কাঠ ও পাতায় আগুন দেয়, তাহাতে ভুট্টা সেঁকে, আর খায়—ভারি স্ফূর্তি। আবার চাহিয়া লয়—কেহ দুটা, কেহ তিনটা, কেহ চারটা ভুট্টা খাইয়া ফেলিল। তাকের রাশিকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহারা উঠিয়া বলিল,-'খুব খাইয়েছিস বিদ্যাসাগর'। ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়াইযা দেখিতে লাগিলেন। আমিও আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম—এরকম বোধহয় আর দেখিতে পাইব না।"

জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'বড়লোকের বাটীতে যাওয়া অপেক্ষা এ সকল লোকের (সাঁওতালদের) কুটীরে যাইতে আমায় ভাল লাগে, ইহাদের স্বভাব ভাল ইহারা কখন মিথ্যা কথা বলে না ইত্যাদি কারণে এখানে (কার্মাটারে) থাকিতে ভালবাসি।' পিতাকে লিখছেন, 'সাংসারিক বিষয়ে আমার মতো হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে-বিষয়ে কোনও অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এই প্রাচীন কথা কোনক্রমেই অযথা নহে, সংসারী লোকে যে-সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনের অন্তঃকরণেও যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই। সে বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই।'

কেউ একজন বিদ্যাসাগরের নামে নিন্দা করেছেন। বিদ্যাসাগর শুনে বললেন, ও, ভেবে দেখি, সে আমার নিন্দা করবে কেন? আমি তো কখনো তার কোনো উপকার করিনি।'

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন, 'আসলে বিদ্যাসাগর দেবত্ব ও ব্রাহ্মণ্যের সকল গৌরব-বর্জিত ভাবে মানুষকে মানুষরূপেই মহৎ ও মহনীয় দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গুরু ও শালগ্রামশিলার দেশে তাঁহাকে অপরিসীম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।'

তাহলে পঞ্চতন্ত্রের সেই গল্পে আমি, এক কুঁড়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর তাড়া খেয়ে ভাগ্যের সন্ধানে বনের পথ ধরে চলেছে। কোথায় যাবে

কোনো পরিকল্পনা নেই। চলতে চলতে ক্ষিদে আর জলতেষ্টা দুটোই পেয়েছে। প্রথমে তেষ্টা। জলের খোঁজে একটা পাতকুয়ার দেখা মিলল অবশেষে। কিনারে এসে উঁকি মেরে দেখে কী, কুয়োর মধ্যে, একেবারে তলায় পড়ে আছে, একটা বাঘ, একটা বাঁদর, একটা সাপ আর একজন মানুষ। ব্রাহ্মণ মুখ বাড়াতেই তারাও ব্রাহ্মণকে দেখে ফেলেছে।

বাঘ তখন উদ্ধারের আশায় চিৎকার করছে, 'হে দয়ালু, জ্ঞানী ব্রাহ্মণ, একটি জীবন রক্ষার মতো পুণ্যকর্ম আর নেই, তুমি অবশ্যই জান, অতএব আমাকে টেনে তুলে সেই পুণ্য অর্জন কর।'

ব্রাহ্মণ বললে, 'তোমাব নামেই মানুষের হৃদকম্প হয়, তোমাকে আমি উদ্ধার করব! বাঘের সঙ্গে মানুষের কী সম্পর্ক, আমি কি তা জানি না!'

বাঘ বলল, 'আমি তিন সত্যি করছি, তোমাকে আমি খাব না।'

ব্রাহ্মণ বাঘটাকে টেনে তুলল। বাঘ জলটল ঝেড়ে বললে, 'ব্রাহ্মণ এই উপকারের প্রতিদান আমি দিতে চাই। ওই যে দূরে দেখছ পর্বতশৃঙ্গ। ওর সর্বোচ্চ চূড়ায় আমার বাস। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার, উত্তর ঢালে আমার গুহায় এস। মরার আগে তোমার ঋণ শোধ করে যেতে চাই। পরের জন্মে টেনে নিয়ে যেতে চাই না।' বাঘ ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

বাঁদর তখন চিৎকার করছে, 'আমার কী অপরাধ! ব্রাহ্মণ আমাকেও উদ্ধার কর।'

বাঁদর উদ্ধার পেল। যাবার সময় বলে গেল, 'বাঘের গুহার কাছেই ঝরনার ধারে আমি থাকি। অবশ্যই এই উপকারের প্রতিদানে আমি কিছু করতে চাই।'

বাঁদর চলে গেল। এইবার সাপের প্রার্থনা। ব্রাহ্মণ বললে, 'পাগল হয়েছ! তোমাকে কে না চেনে! এক ছোবলেই মানুষ খতম। মাপ করো ভাই।' সাপ তিন সত্যি করে বললে, 'এইটাই মানুষের ভুল ধারণা। কারণ না থাকলে আমরা ছোবল মারি না। তুমি আমাকে উদ্ধার করে দেখ। বিপদের পড়লে আমিও তোমার উপকার করব।'

ব্রাহ্মণে তিনটি প্রাণীকেই উদ্ধার করল। প্রত্যেকেই যাওয়ার সময় একই সাবধানবাণী শুনিয়ে গেল; ব্রাহ্মণ, ওই মানুষটি সম্পর্কে খুব সাধান। ওটি হল পাপের আড়ত, উদ্ধার করেছ কী মরেছ। ওর কথা শুনো না।' কুয়োর লোকটা ততক্ষণে কাকুতি মিনতি শুরু করেছে।

ব্রাহ্মণ ভাবলে, তিনটে পশুকে উদ্ধার করলুম, আর আমার জাতভাইটা পড়ে থাকবে! ব্রাহ্মণে এই ভেবে লোকটিকেও টেনে তুলল।

ভদ্রলোক উঠেই বললে, 'ব্রাহ্মণ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শোনো আমি স্বর্ণকার। পাশের শহরেই আমার সোনার দোকান। যখনই প্রয়োজন হবে আমার কাছে এস। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে বিস্তর খুশি হব।' লোকটি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ব্রাহ্মণ এইবার তার ভাগ্যের সন্ধানে দিগ্বিদিক ঘুরতে লাগল। কোথায় কী! কিছুই আর জোটে না। শেষে সে সেই ঝরনার ধারে বাঁদরের কাছে গেল। কৃতজ্ঞ বাঁদর ব্রাহ্মণকে প্রচুর ফল দিয়ে বললে, 'এই শেষ নয়, তোমার যখনই ফলের প্রয়োজন হবে তখনই চলে আসবে।'

ব্রাহ্মণ বললে, 'বাঘ তো তোমার কাছাকাছি থাকে তার সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দাও।'

বাঘ তো মহাখুশি, 'উপকারী বন্ধু তুমি এসেছ। এই নাও কিছু স্বর্ণালঙ্কার। পাকা সোনায় তৈরি। কয়েকদিন আগে এই রাজ্যের রাজার পুত্র দলছাড়া হয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এই দিকে চলে এসেছিল। আমারও খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। এই অলঙ্কারগুলো তার শরীরে ছিল। নিয়ে যাও। তোমার কাজে লাগবে।'

ব্রাহ্মণ সেই সব অলঙ্কার নিয়ে এল সেই স্বর্ণকারের কাছে এই ভেবে, স্বর্ণকার গহনাগুলো বিক্রি করে দিলে অনেক টাকা নিয়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কাছে ফিরে যেতে পারবে।

স্বর্ণকার মহাসমাদরে ব্রাহ্মণকে পাদ্য অর্ঘ দিয়ে বসালেন, উপহার দিলেন, খাদ্য-পানীয় তৃপ্ত করে প্রশ্ন করলেন, 'কী করতে পারি আপনার?'

'আমি কিছু সোনার গয়না এনেছি, যদি বিক্রি করে দেন অনুগ্রহ করে, অর্থের বড় প্রয়োজন।' স্বর্ণকার গয়নাগুলো দেখেই চিনতে পেরেছে। এগুলো তো সে রাজপুত্রের জন্যেই বানিয়েছিল। স্বর্ণকার বললেন, 'আপনি একটু বসুন। এগুলো আমি একজন উপযুক্ত লোককে দেখিয়ে আনি।'

ব্রাহ্মণ বসে আছে। স্বর্ণকার সোজা রাজদরবারে। রাজা তো দেখেই চিনেছেন।

'কোথায় পেলে তুমি এই গয়না?'

'এক ব্রাহ্মণ বিক্রি করার জন্যে আমার দোকানে এনেছে।'

'কোথায় সে?'

'বসিয়ে রেখে, একটা ছুতো করে চলে এসেছি আপনার কাছে।'

'এই ব্রাহ্মণই তাহলে খুনী, রাজপুত্রকে হত্যা করেছে! এই কে আছিস..।'

রাজকোটাল সঙ্গে সঙ্গে হাজির।

'যাও ব্রাহ্মণকে বেঁধে এনে শূলে চড়াও।'

ব্রাহ্মণকে চেনে দিয়ে বাঁধা হয়েছে। প্রাণদণ্ডের আদেশ। মনে মনে সাপের কথা ভাবছে। সে যদি এসে আমার এই বন্ধন দশা মুক্ত করত! সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞ সাপ এসে হাজির,

'ব্রাহ্মণ কিচ্ছু ভেব না, তোমার মুক্তি আমার হাতে।'

'কী ভাবে? আমাকে ছোবল!'

'না, রানীকে ছোবল মারব, মরে যাবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু যেই তুমি গায়ে হাত দেবে রানী জীবন ফিরে পাবে। দেখ না মজাটা!'

সাপ তক্ষুনি রানীকে গিয়ে দংশন করল। রানীর মৃত্যু। ওঝারা সব ব্যর্থ। রাজা তখন ঢেঁড়া দিলেন 'যে রানীকে বাঁচাতে পারবে...'

বন্দী ব্রাহ্মণ বললে, 'অনুমতি করুন, আমি একবার চেষ্টা করি, মনে হয় পারব।'

ব্রাহ্মণ হাত ছোঁয়ানো মাত্র রানী চোখ মেলে তাকালেন। ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

কৃতজ্ঞ রাজা তখন জানতে চাইলেন ঘটনাটা কী, 'কোথায় পেলেন রাজপুত্রের এই অলঙ্কার!'

ব্রাহ্মণ তখন সব বললে, গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত।

কোতোয়ালকে হুকুম হল, 'বাঁধ ওই স্বর্ণকারকে। আর ব্রাহ্মণকে দান কর এক হাজার গ্রাম ও প্রচুর ধনরত্ন।'

রাজানুগ্রহে ব্রাহ্মণ হল সম্পন্ন জমিদার।

গল্পের কুচক্রী শাস্তি পায়, সৎ উপকারী রাজত্ব পায়। বাস্তব জীবনে এর বিপরীতটাই সত্য।

রাজনারায়ণ বসুকে বিদ্যাসাগর একটি ছড়ায় লিখলেন,

পৃথিবীতে যত বেটা, সব বেটা গরু।
যে যারে ঠকাতে পারে, সেই তার গুরু॥

ব্যর্থ হবে বফর্স

সব শেষে তৈরি করলেন মানুষ। ছড়িয়ে দিলেন পৃথিবীতে।

তারপর ভগবান বসলেন বৈঠকে, কী করা যায়! কোথায়, কোথায় লুকিয়ে রাখা যায় মানুষ সৃষ্টির এই রহস্য। কে মানুষ, এই তথ্যটিকে কোথায় গোপন করা যায়! অন্যান্য দেবতারাও সব হাজির। কী করা যায়!

এক দেবতা বললেন, 'চলুন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় বরফ চাপা দিয়ে রেখে আসি। আর এক দেবতা বললেন, 'না, না, ওটা খুব সুবিধের জায়গা হবে না। বরং ওটাকে আমরা গর্ত খুঁড়ে পৃথিবীর কেন্দ্রে রেখে আসি।'

উপস্থিত আর এক দেবতা মাথা নেড়ে বললেন, 'ধ্যুস্, ওটাও নিরাপদ জায়গা নয়, তার চেয়ে সমুদ্রের গভীরে লুকিয়ে রাখাই ভাল।'

মহা সমস্যা, মতের মিল কিছুতেই আর হয় না। কোথায় রাখা যায় এই রহস্য। শেষে স্বয়ং ভগবানই বিধান দিলেন, 'আরে সব চেয়ে ভাল জায়গাটা আপনারা খুঁজে পেলেন না!'

'কোন জায়গা! আপনি কী পেয়েছেন?'

'অবশ্যই। আসুন, আমরা এই জ্ঞান, এই তত্ত্ব, এই রহস্য, আমরা মানুষের ভেতরেই রেখে দি।

মানুষ বহে বেড়াবে, দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়াবে, বাইরে খুঁজবে, ভুলেও ভেতরের দিকে ফিরে তাকাবে না। তাকালেও দেখতে পাবে না। এমন এক অনুসন্ধান, যে কায়দাটা লক্ষে একজন, দুজনই জানবে।' বাহবা, বাহবা করে উঠলেন দেবতারা। জবরদস্ত ব্যবস্থা। অনুসন্ধানকারীর পকেটেই অনুসন্ধানের বস্তু।

প্রতিটি পেট্রল পাম্পে সেই যন্ত্রটি আছে, অয়েল পাম্প। ডিজিট্যাল মিটার লাগানো। দ্রুত সংখ্যা পাল্টে যায়। আমাদের পৃথিবীটা সেই রকম দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ভাল লাগছে না এই পরিবর্তন। ভাল আর মন্দ এখন অতি স্পষ্ট। আগে মাঝামাঝি একটা পর্যায় ছিল। বদের

মধ্যে ভাল কিছু, ভালর মধ্যে মন্দ কিছু, এইরকম একটা সহনীয় ব্যাপার ছিল। কোনোটাই সহ্যসীমা অতিক্রম করে যেত না। তিনি বললেন, মেরেছিস কলসির কানা তা বলে কী প্রেম দেব না! আমি জানাই অমনি সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভুর পদতলে। জগাই মাধাই অচিরে উদ্ধার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে বললেন, বেশ, তোমার বকলমা আমাকে দাও। গিরিশ বললেন, আমাকে তোমরা দেখ, আমার পরিবর্তন, তাহলেই বুঝবে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি, তাঁর মহিমা, তাঁর করুণা। গিরিশ যেখানে বসত, সেখানে সাতহাত জমির গভীরে পাপ চলে যেত। দেখ, তিনি আমার কী রূপান্তর ঘটিয়েছেন। ঠাকুর অপকট হওয়ার পর, কালীঘাটে গিয়ে সারা রাত হাঁড়িকাঠের কাছটিতে চুপ করে বসে থাকতুম। কেন জান? নিত্য কত ছাগ বলি হয়। সেই আর্তচিৎকারে মায়ের দৃষ্টি এইখানে পড়তে বাধ্য। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা সারা মন্দিরে আর দ্বিতীয় কোথাও নেই। রাতের পর রাত তাই গিরিশকে হাঁড়িকাঠের পাশে বসিয়ে রাখি।

ঘোষ গিরিশের কী জেদ। দেখতে চাই শ্রীরামকৃষ্ণের ঠাকুর, তোমার পুণ্য প্রভাব গিরিশের আঁধার ঘরে আলো জ্বালতে পারে কী না! গিরিশবাবু থিয়েটার থেকে বেরিয়ে চলে যেতেন বেশ্যালয়ে। প্রথম রাতটা সেখানে কাটালেও শেষ রাতে নিজের বিছানায় এসে অবশ্যই শোবেন। একদিন সিদ্ধান্ত করলেন, আজ সারারাত বেশ্যালয়েই থাকব, দেখি তোমার ক্ষমতা কত দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর। কাম আর কাঞ্চনে তোমার অপ্রীতি। তোমার যত ক্ষোভ। হাতে টাকা ছোঁয়ালে তোমার আঙুল বেঁকে যায়। তোশকের তলায় লুকিয়ে রাখলে, তুমি ঠিক ধরে ফেল। বসা মাত্রই লাফিয়ে ওঠ, যেন বৃশ্চিক দংশন হল। তোমার না কী সন্তান ভাব! নারীর দিকে তাকালেই তুমি শিশু হয়ে যাও। নিজের স্ত্রীকে আসনে বসিয়ে ভবতারিণী জ্ঞানে পুজো করে নিজের সাধন ফল ও জপের মালটি পর্যন্ত সমর্পণ করে দিলে! তিন মাকে এক করে ফেললে, নিজের মা, ভবতারিণী মা ও সারদা মা।

গিরিশ সামান্য এক গণিকার পাশে শুয়ে শুয়ে ভাবছেন এই সব। আর মনে মনে সম্মুখ সমরে আহ্বান করছেন ঠাকুরকে। নেশায় চুর হয়ে আছেন। এসো দেখি এইখানে, এই মদ আর মেয়েমানুষের গন্ধে। রাত এগোচ্ছে। শেষ রাত এসে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে বাড়ি চলে যাওয়ার কথা। উঠছেন না। ঠাকুরের সঙ্গে লড়াই।

বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছেন নট ও নাট্যকার, বাংলার 'গ্যারিকে' গিরিশচন্দ্র, বিবেকানন্দের জি সি। আর দশ মাইল দূরে দক্ষিণেশ্বরের নির্জন নিরালা মন্দির সংলগ্ন তাঁর ছোট্ট ঘরখানিতে মনুষ্যরূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দুই করে মৃদু তালি বাজাতে বাজাতে তরল অন্ধকারে একবার এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশ চলে বেড়াচ্ছেন। ভাবাবেশে টলছেন। পরিধানের বস্ত্র অসংলগ্ন হয়ে আছে। ধারালো দুটি ঠোঁটে মৃদু হাসি। মনে মনে স্মরণ করছেন, গিরিশকে কী বলেছিলেন একদিন, 'তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বল, তা হোক ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল। উপাধি নাশের সময়েই শব্দ হয়। কাঠ পোড়াবার সময় চড়চড় শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না। তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে। তোমার এমনিই হবে।'

ঘরের মাঝখানে ঠাকুর থমকে দাঁড়িয়েছেন। পশ্চিমের গঙ্গায় জল কল্লোলের শব্দ। ঠাকুর বলছেন, 'মা! যে ভাল আছে তাকে ভাল করতে যাওয়া কি বাহাদুরি? মা! মরাকে মেরে কি হবে? যা খাড়া হয়ে রয়েছে তাকে মারলে তবে তো তোমার মহিমা?'

এরপর কী হল! শোনা যাক গিরিশবাবুর বয়ানে, 'রাত তখন তৃতীয় প্রহর। হঠাৎ সর্বাঙ্গে একটা জ্বালা। যেন শত সহস্র বিছা কামড়াচ্ছে। তবু পড়ে আছি জেদ করে। সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে উঠে পড়লুম। মেয়ে মানুষটি প্রশ্ন করলে, 'কোথায় চললে গো!'

'হঠাৎ মনে পড়ল বাক্সর চাবি বৈঠকখানায় ফেলে এসেছি।'

'মিথ্যে কথা। দ্রুত বাড়ি ফিরে এসে শান্তি। পরের দিন গেছি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে- 'কাল রাতে তোমাকে পরীক্ষা করলুম ঠাকুর। ইচ্ছে করে পড়েছিলুম বেশ্যালয়ে। সে আমার থিয়েটারে অভিনয়ও করে। শেষ রাতে আমার বাড়ি ফেরার কথা। রোজই তাই করি। কাল তোমার ক্ষমতা পরীক্ষার জন্যে বিছানায় পড়েছিলুম। যেই রাত তিনটে হল, সারা শরীরে অসহ্য জ্বালা। বিছের কামড়ের বিষাক্ত জ্বালা। মিথ্যে কথা বলে ছিটকে বাড়ি চলে এলুম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সব শুনলেন। উত্তেজিতভাবে বললেন, 'শালা, তুই কি ভেবেছিস তোকে ঢ্যামনা সাপে ধরেছে, যে পালিয়ে যাবি?- এ জাত সাপে ধরেছে তিন ডাক ডেকেই চুপ করতে হবে।'

'শ্রীচৈতন্য অবতারে তুমি জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছিলে, এবার করলে গিরিশচন্দ্র ঘোষকে।' যে কথায় এই কথা এল, দুশো বছর আগে আর পরে মানুষের কী পরিবর্তন। ভালো আর মন্দের জ্ঞানটাই উবে গেছে। আমি শ্রীচৈতন্য, আমি মাধাই নই, আমি মাধাই, শ্রীচৈতন্য নই এই বোধটাই হাওয়া। হু ইজ শ্রী চৈতন্য, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি মানুষ। মানুষের আবার রহস্য কী। ওসব নিয়ে কে মাথা ঘামায়! রহস্য জানলেই বা কী, না জানলেই বা কী! আকণ্ঠ মদ খাবো, যাবতীয় পাপকর্ম করব। পাপ শব্দটা মধ্যযুগীয়। একবিংশ শতাব্দীতে কর্মের কোনো বিশেষণ থাকবে না। পাপও নেই, পুণ্যও নেই। কর্মটা থাকবে। আমরা কেউ ছুটব না কোনো কৃপাসিন্ধু অবতারের কাছে। গিরিশ-শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ কথোপকথন আর শোনা যাবে না,

গিরিশ : মহাশয়, আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি, তিনিই সব করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : আমি বলি, মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ; আমি জড়, তুমি চেতয়িতা, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি। যারা অজ্ঞান তারা বলে, কতক আমি করছি কতক তিনি করছেন।

গিরিশ : মহাশয়, আমি আর কি করছি, কর্মই বা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ : না গো, কর্ম ভালো। জমি পাট করা হলে যা বুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

গিরিশ : আপনি তবে আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : তুমি মার নামে বিশ্বাস করো, হয়ে যাবে।

গিরিশ : আমি যে পাপী।

শ্রীরামকৃষ্ণ : যে পাপ-পাপ করে, সেই শালাই পাপী হয়ে যায়। ও কি? পাপ কিসের? আমি কীট, বলতে বলতে কীট হয়ে যায়! আমি মুক্ত, আমি মুক্ত এ অভিমান রাখলে মুক্ত হয়ে যায়। সর্বদা মুক্ত অভিমান রাখলে পাপ স্পর্শ করবে না।

তাহলে কোন তত্ত্বকে মানুষের মধ্যে গোপন করে রাখলেন স্রষ্টা। গিরিশ বুঝেছিলেন-' কেবল তাঁহার বিমল স্নেহের উপলব্ধিই মুক্তি। উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব। উপলব্ধিই মানবজীবনের চরম অবস্থা।'

মৃত্যুপথযাত্রী এক ক্যানসারের রোগী এক রাতে স্বপ্ন দেখছেন, জ্বলন্ত একটি মোমবাতির শিখা কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে নিবেই গেল। ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসলেন। স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারলেন। জীবনদীপ নির্বাপিত হবে এবার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়লেন।

তন্দ্রা এসে গেল। অদ্ভুতভাবে ভাঙা স্বপ্ন জোড়া লাগল। এবার দেখছেন, বাতিটা জ্বলছে। জ্বলছে জানলার বাইরে প্রদীপ্ত শিখায়। কাচের ওপাশে। বুঝলেন, মৃত্যু বলে কিছু নেই। অবিচ্ছিন্ন জীবন। আধারটাই পাল্টায়। শিখা ঘরছাড়া হয়। এপাশে নিবলে ওপাশে জ্বলে ওঠে আবার। এই স্বপ্ন দেখার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভদ্রমহিলা মারা গেলেন।

ভগবান এই তত্ত্বটিকে লুকিয়ে রেখেছেন মানুষেরই অন্তরে।

গৌতম বুদ্ধ বসে আছেন আসনে। রাজা, মহারাজা, ধনকুবেররা আসছেন, প্রণাম করছেন, মহার্ঘ্য বস্তুসমূহ নিবেদন করছেন। কোথা থেকে এলেন এক বৃদ্ধা ভিখারি। তিনি দেখেছেন তথাগতকে কত জনে কত কী নিবেদন করে যায়! তাঁর তো কিছুই নেই দেবার মতো! সেদিন তিনি একটি প্রদীপ সংগ্রহ করেছেন। ভিক্ষে করে একটু তেলও জোগাড় করেছেন। এইবার সেই প্রজ্বলিত ক্ষুদ্র প্রদীপটি প্রভুর চরণ সমীপে রাখতে রাখতে বলছেন,

'আমার কিছুই নেই প্রভু, এই প্রদীপটি ছাড়া। প্রভু, এই প্রার্থনা, ভবিষ্যতে আমার জ্ঞানের প্রদীপটি যেন আপনার আশীর্বাদে জ্বলে ওঠে। আমি যেন অন্ধকারে যারা আছে তাদের আলোতে আনতে পারি। তাদের সমস্ত অবরোধ দূর করে আমি যেন তাদের চৈতন্যের আলোতে মুক্তি দিতে পারি।'

সেই রাত ভোর হয়ে গেল। প্রাতে বৃদ্ধশিষ্য মৌদগল্যায়ন বুদ্ধসমীপে এসে অবাক হয়ে গেলেন। অন্য শত দীপ নির্বাপিত হয়েছে সেই কখন, শুধু ছোট্ট একটি প্রদীপ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে আছে তখনো।

মৌদগল্যায়ন প্রদীপগুলি নিতে এসেছেন। জ্বলন্ত দীপটিকে নেবাবার জন্যে কত চেষ্টা করছেন। নেবে না কিছুতেই।

বুদ্ধদেব মৃদু হেসে বললেন, 'ব্যর্থ চেষ্টা করো না। ও দীপ নিববে না। এমন কি নড়াতেও পারবে না। সাত সাগরের জল ঢাললেও হবে না। কেন জান, ওটি হল, বিশ্বাসের প্রদীপ, প্রেমের প্রদীপ, নিজেকে নিবেদনের প্রদীপ। ওটি হল চৈতন্যের দীপ। মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন ওটি জ্বলে থাকবে। ওই চেতন দীপ।'

কত শতাব্দী চলে যাবে। আবর্ত জটিল থেকে জটিলতর হোক না! শ্রীরামকৃষ্ণও চৈতন্যের দীপটি জ্বেলে গেছেন মানবমন্দিরে। নাটমন্দিরে অদৃশ্য গিরিশের চৈতন্যলীলা, বুদ্ধচরিত পালা। বফর্স কামান দেগেও ভাঙা যাবে না, চৈতন্য মন্দির।

জ্ঞানদা, মোক্ষদা

মানুষের অসভ্যতা মানুষকে সহ্য করতেই হবে। এসেছ যখন ভবে থাকার মাশুল দিতেই হবে। আমরা যাকে সভ্যতা বলি, সেটা হল মানুষের ডেকরেশান, মানুষের অলঙ্কার। বাইরের চাকচিক্য। আগে ছিল চারপকেট-আলা ফতুয়া, খেঁটে ধুতি, এখন সেটা হয়েছে, বারমুডা টিশার্ট। আগে ছিল শেমিজ, এখন ম্যাক্সি। আগে পুরুষরা পরত স্যান্ডো গেঞ্জি, এখন মেয়েরা পরে স্যান্ডো ব্লাউজ। কাঠের উনুন, তোলা উনুনের বদলে গ্যাস, মাইক্রো ওভেন, কুকিং রেঞ্জ। আগে জল থাকত কুয়োয়, এখন থাকে বাড়ির মাথায়। আগে টয়লেট থাকত বাড়ির বাইরে। বর্ষার রাত বিরেতে প্রয়োজন হলে যেতে হত টোপর মাথায়। আমার ছেলেবেলায় দেখেছি, বর্ষার রাতে আমার আত্মীয় কী করেন! গুরুপাক পাক মারছে পেটে, বিয়ের টোপর মাথায় দিয়ে চলেছেন ডোবার ধারের টয়লেটে। সাপে ব্যাং ধরেছে, শেয়াল ডাকছে বাঁশ বাগানে। এখন সেই জিনিসই সভ্য হয়ে চলে এসেছে শোবার ঘরে, খাটের পাশে। পা বাড়ালেই শান্তিলাভ। আগে মানুষ মাইলের পর মাইল হাঁটত। এখন মানুষ মাইলের পর মাইল বাহনের ভেতর হয় লাড্ডু পাকিয়ে থাকে, না হয় বাদুড়ের মতো ঝোলে, আর জপ করে, রাখে কেষ্ট মারে কে। আগে মানুষ আসনে বসে সপ্ত ব্যাঞ্জন খেত, এখন পথের পাশে নর্দমার ধারে দাঁড়িয়ে নিউজ প্রিন্টের স্কার্ট পরা রোল খায়। আগে বাঁদিপোতার গামছা দিয়ে অঙ্গমার্জনা করত। এখন ঢাউস তোয়ালে। যা কোনো দিনই শুকোয় না। সভ্য মানুষের নাক যন্ত্রসভ্যতার যাবতীয় গ্লানিতে ও সাইনোসাইটিসে ঘ্রাণশক্তি হারিয়েছে, তা না হলে বুঝতে পারত, তোয়ালে হল গন্ধগোকুল। আগে মানুষের খিদে পেত। এখন পায় না। খাওয়া আছে খিদে নেই। আগে মানুষ একটা লক্ষে যেত, এখন মানুষের ওপর দিয়ে দিন যায়, একটু একটু করে বিবস্ত্র করতে করতে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে ফেলে। আগে ফেলত কাঠের চিতায়, এখনে ফেলে ইস্পাতের চাটুতে। এক ঘণ্টার মধ্যেই পাউডার। এক

ফুঁ। যাঃ উড়ে গেল ম্যানেজিং ডিরেক্টার। কাচের ঘর, ঘোরানো চেয়ার, তিনটে ফোন, ইন্টারকম, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, বাইরে গরম, ভেতর ঠাণ্ডা গাড়ি, ছোট বড় হরেক বুলি, সেমিনার, কনফারেন্স, বোতল, বোনাস, সব শেষ! ট্যালকম পাউডার। আগে মানুষ ছাই দিয়ে বাসন মাজত, প্রয়োজনে দাঁতও ঘষত, এখন লম্বা হাতল ঢেউ খেলান বুরুশ, পেট টেপা পেস্ট। আগে মানুষ গায়ে তেল মাখত সরষের খোল মাখত, এখন মাখে বডি লোসান। বডি লোসানের বাঙলা কী হবে? শরীর নির্যাস। শরীর নির্যাস তো বটেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যা দুটাকা রোজগার হল, তার বারো আনা বেরিয়ে গেল কসমেটিকসে। মাথায় অবশিষ্ট রয়েছে দশ পয়সার চুল, তাইতে ঢালা হল দশ টাকার শ্যাম্পু। সেই শ্যাম্পুই আবার কত রকম। কোনোটা চুলের শিকড়ে ঢুকে প্রোটিন খাইয়ে আসে। কোনোটা খুসকির সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামে। কোনোটা চুলে পালিশ মারে। সব শ্যাম্পুই হল একালের নেতাদের মতো। অজস্র প্রতিশ্রুতি, কাজের বেলায় অষ্ট রমভা। নিচের তলা চেঁচিয়েই মরে গেল, এ লড়াই বাঁচার লড়াই, ওপর তলায় হাওলা আর গাওলা।

ভেতরের মানুষটার কিছুই হল না। সবই কসমেটিক অ্যাপ্রোচ। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন। অ্যাটিকেট? সে আবার কী বস্তু? সভ্য মানুষের সভ্য সমাজে কিছু আচার আচরণ মানতে হয়। ছাগলের মতো গুঁতোগুঁতি করতে নেই। যত্রতত্র খিস্তি করাটা অশোভন। যেখানে সেখানে ছড়ছড় গরুর ধর্ম, মানুষের নয়। পথ চলার সময় যত তাড়াই থাক, পাশ কাটিয়ে যেতে হয়, পেছন থেকে তাকে খাবলাতে নেই। প্রেম তো অনেক পরের কথা, মেয়েদের আগে সম্মান করতে শিখতে হয়। সভ্যতা মানে রেপিস্ট হওয়া নয়। সব মহিলা বারবনিতা হলে অনেকের সুবিধে হলেও পৃথিবীটা জারজে ভরে যাবে। বাবা শব্দটা শুধু অভিধানে থাকবে। যদিও সমাজের গুরু, টিভি আর হিন্দি ছবি সেই রকমেরই একটা সমাজ তৈরি করতে চাইছে। ব্যবসা মানে, স্মাগলিং, ড্রাগ ট্র্যাফিকিং। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার, গদাম গদাম ঘুসি আর ছুরি। আর নারীর প্রতি ব্যবহার? সব খুলে নিয়ে কৌপিন পরিয়ে নাচ, আর টেনে এনে বিছানায় ফেলা। নায়ক এসে শেষ সিনে ঘুসোঘুসি করে সব ব্যাটাকে কাবু করলেও, পরের ছবিতে আবার সব বেঁচে উঠবে। একজন প্রশ্ন করেছিলেন,

'মশাই! আপনার দেখারই বা কী দরকার, আর ভাবারই বা কী দরকার! আপনি কি ফাদার অফ দি নেশান, না ন্যাশন্যাল ফাদার! খাবেন দাবেন, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বেন, নাক ডাকিয়ে ঘুমোবেন। মরার সময় মরে যাবেন। অত কী! জাতির চিন্তা মাথায় নিয়ে পেঁচার মতো রাত জাগা। আপনি রামমোহন রায়, না বিদ্যাসাগর। কে কাকে গুঁতোলো, কে কার বস্ত্রহরণ করল, দেহ ব্যবসা কেন বাড়ছে, কেন ডাকাতি হচ্ছে, কেন যুবশক্তি গেঁজে যাচ্ছে, কেন স্বামী বিবেকানন্দের সভায় লোক হল না, কেন চিত্রতারকাকে দেখার জন্য স্ট্যামপিড হয়। আপনার এতে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণটা কী! কিছু মানুষের অসভ্যতা কিছু মানুষকে সহ্য করতেই হবে। আগেও হয়েছে এখনো হবে।'

ভেবে দেখলুম। ভাবতে গিয়ে ধরা পড়ল, আমিও কম শয়তান নই। মুখে বলি হরি, কাজে অন্য করি। 'আরে এসব দেখা উচিত নয়', বলে নিজেই তারিয়ে দেখি, যেন সেনসার কমিটির মেম্বার আমি। টিভি আমার, খরচ করে কেব্‌ল কানেকসানও নিয়েছি। তার ছিঁড়ে, স্ক্রিন ভেঙে কই আমি তো একটা বিপ্লব করতে পারছি না। কই বাড়িতে খবরের কাগজ ঢোকা তো বন্ধ করতে পারিনি। ফাঁক পেলেই তো ওইসব ইতর খবর পড়ে ফেলি।

কেন এমন করি? ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করা কি অত সোজা মানিক! সে যে বড় কঠিন কাজ। ভণ্ড হওয়া অনেকে সহজ, সাচ্চা হতে গেলে ইস্পাত হতে হবে। তার জন্যে আলাদা এক ধরনের শিক্ষা আছে, যা ঋষিকুলে দেওয়া হত অনেক অতীতের ভারতে। তাঁরা প্যান্ট, পাৎলুন, কোট, টাই পরা, শ্যাম্পু ফুরফুরে, কোলনগন্ধী, 'সভ্য-অসভ্য', চোর, ছ্যাঁচোর, চুল্লুসেবী, মদ্যপায়ী নারীনির্যাতনকারী প্রেমিক, অথবা রূঢ়ভাষী কেরিয়ারসর্বস্ব, আত্মকেন্দ্রিক, শিশ্নোদরপরায়ণ একজিকিউটিভ, বাপ-মাকে পুকুরে চোবানো, জরুকা গোলাম তৈরি করতে চাননি। চেয়েছিলেন মূল্যবোধসম্পন্ন জ্ঞানী গৃহীর সমাজ তৈরি করতে। যে-সমাজে সব নারী-পুরুষের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। তাঁরা শুরুই করলেন এই ভাবে : ঈশো বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধন কস্যস্বিদ ধনম্॥

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যা কিছু আছে, সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করছেন। ভোগের বস্তু এখানে অনেক। ভোগ অবশ্যই করবে,

তবে তার সঙ্গে যেন ত্যাগ থাকে। কখনো কারো ধনসম্পদে লোভ করবে না।

এই রে, এ আবার সংস্কৃত কপচায় রে। ডেড ল্যাঙ্গোয়েজ। ছাত্রজীবনে বাপের সম্পত্তির সংস্কৃত করেছিল, বাপস্য সম্পত্তি। পণ্ডিতমশাই রেগে রেজিগনেশান দিয়ে স্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এখন বই খুলে কোটেসান ঝাড়ছে।

বেশ, তাহলে সায়েবদের দিক থেকেই আসি। সায়েবরা না বললে আমাদের শ্রদ্ধা তো আসবে না। জগদবিখ্যাত এক সাইকোথেরাপিস্ট ও লেখক, ডক্টর ওয়েন ডব্লু ডায়ার লিখছেন, আচ্ছা বল তো Form কাকে বলে? আকার, আকৃতি। তোমার একটা ফর্ম, একটা আকৃতি আছে। সেটা কী দিয়ে তৈরি?

Form includes the total weight of your bones, arterties blood vessels, skin, eyeballs, toenails, heart, lungs, kidneys, and anything else that you can name in your physiology. Yet certainly you are much more than a pile of bones skin and component parts. ওটা তোমার খাঁচা। যেটাকে তুমি 'আমি' বল, সেটা কোথায়!

খাঁচা খাঁচার নিয়মে চলবে। ওটা একটা যন্ত্র। সারা জীবনে ওই খাঁচা বহুবার পাল্টাবে। প্রথমে তুমি ছিলে ছোট্ট এতটুকু একটা শিশুর খোলে, তারপর সেই খোল বেড়ে হল কিশোর, কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে প্রৌঢ়। প্রতি সাতবছর অন্তর দেহ কোষ পাল্টেছে; কিন্তু তোমার 'তুমি' সেই একই আছে। The Form has completely changed manytimes, and yet the real 'You' has remained constant. তোমার প্রকৃত 'তুমিটা' ধরাছোঁয়ার বাইরে। Everything that you would see in that pile of form you will also find in a pig or a horse. the real you, the unique you is 99 percent invisible, untouchable, unsmellable, and impervious to the physical senses, which know only form.

ছাগল ছাগলের আকৃতিতে পাতা মাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে, শেষে মানুষে তাকে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে বেশ করে কষে খেয়ে ফেলছে। শূকর ময়লার গাদায় ছানাপোনা নিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করছে। ছুঁচোর মতো 'ফানেল টাইপ' মুখ নিয়ে নর্দমার পাক খাচ্ছে। অবশেষে নিউমার্কেটের স্টলে বেঁচে থাকার সেলামি দিচ্ছে 'সালামি' হয়ে। মৃত্যুর

পর অসম্মানের শুয়োর নাম ঘুচে সায়েবি বাহার, হ্যাম, বেকন। মানুষের তফাতটা কোথায়। The only talking and thinking animal. মানুষের গৌরবের ভাগটা পড়ে আছে ওই নিরানব্বই ভাগ অদৃশ্য অংশে, The largest chunk of who you really are is something beyond form. ডায়ার সায়েব আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাই তাঁর দীর্ঘ উপলব্ধি থেকেই শোনাচ্ছেন। গেরুয়া নিয়ে গুহায় যেতে হয়নি। আধুনিক মানুষের তালগোল পাকানো মনের গভীরে তার আসল আমিটাকে খুঁজতে গিয়ে এই আবিষ্কার। খাঁচার ভেতর সেই অচিন পাখিটা কোথায়! আরে, সেটা তো শরীর নয়।

অয়ম অব্যক্তঃ, অয়ম অচিন্ত্যঃ অয়ম অবিকার্যঃ

খাঁচার ইন্দ্রিয় দিয়ে এই আমিটাকে বোঝা যাবে না, মনেরও আগোচর এবং তার কোনো বিকার নেই। স্বামী পরমানন্দ আরো সুন্দর ও বোধগম্য। মরেছে, এ আবার স্বামীর কথা বলছে। আজকাল অ্যালার্জির বৃত্ত এত বিশাল যে, ভগবান স্বামী পরমানন্দ, আনন্দ, নির্বাণ, প্রয়াণ এই সব শব্দ কানে এলেই শরীর চিড়বিড়, চিড়বিড় করে ওঠে। তখন কানের কাছে রাম নাম, হরি নাম নয়, বলাতে হয়, মাল খাও, মালাই খাও, লাথি খাও, ঝ্যাঁটা খাও, তুমি যার স্বামী. তার ধোলাই খাও। ডেলি প্যাসেঞ্জার হয়ে আসন থেকে ঘাড় ধরে বোনাফাইড প্যাসেঞ্জারদের তুলে দিয়ে, সেইখানে জাঁকিয়ে বসে কাঁচা খিস্তি করতে করতে গোলামখানায় যাও। প্রবীণ-প্রবীণাদের ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়, নিজের উদরটিকে তো ফেলা যাবে না। ওই একই কামরায় নিজের ছেলে ছিল ওপাশে। সে এইবার স্কুলের বন্ধুদের বলছে, আমার বাবা, শালা একটা মাল। তারপর! সব কিছুরই তো একটা পর আছে। হিন্দি ছবির কায়দায় আয়, বাবা শালাকে খুন করি।

তবু শুনি, স্বামী পরমানন্দের কথা, 'অধিকাংশ মানুষের কাছেই এই স্থূল দেহটিই তার নিকটতম বাস্তব বস্তু। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তি অথবা অন্তঃস্থ অদৃশ্য আত্মার কথা মুখে অনেকেই বলে থাকে বটে, কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক মানুষই তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে বা তা বুঝতে পারে...বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই স্বীয় শরীরের কর্তৃত্ব আছে। যে শক্তি আমাদের এই দেহকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়। তার অনেকটারই অপচয় ঘটে- এবং সেই অপচয়ের ফলে চক্ষু আমাদের স্বচ্ছ দৃষ্টি দিতে পারে না,

বর্ণাদি অপরাপর ইন্দ্রিয়ও দেয় মাত্র আংশিকজ্ঞান...কিন্তু যখন আমরা আপন সত্তার মূলে পৌঁছাই এবং সকল শক্তিকে একত্রিত করি, তখনই তাদের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হই..।'

ডায়ার সায়েব বলছেন, form-এর আগে trans শব্দটা লাগাও trans মানে beyond, above, over. গেলে transform এরপর যোগ কর ation, মানে action, মানে result, তাহলে নিজের form কে কী করা হল transfomation, অর্থাৎ going beyond ones form. ডায়ার বলছেন, ভাবনাটা উল্টে নাও, ভাব। You are a soul with a body rather than a body with a soul.

-কে এত জ্ঞান কপচাচ্ছে গা ?

-কে আবার, ওই যে !

-কান দিও না, ওসব জ্ঞানদা, মোক্ষদাদের যুগ শেষ, ও ব্যাটাও টেম্পো চাপা পড়ে টেঁসে যাবে। আঃ মান্তার মা পুঁইশাকটা যা রেঁধেছে না, আত্তু দাও তো। বলদের মতো খাই।

-পেটে একটু জায়গা রাখ। আজ তো আবার নাদুর ছেলের বউভাত !

-ও ভেব না, অ্যান্টাসিড মেরে চাপিয়ে দোবো, জোলাপ মেরে খালাস করে দোবো।

উড়বে সাধের ময়না

ছেলেবেলার কথা কখন বেশি মনে পড়ে? যখন বয়েস বেড়ে গিয়ে মানুষ প্রায় হাজা মরা হয়ে আসে। দমকা বাতাস বইলে টুপ করে খসে পড়ে থেঁতলে যাবে। সুস্বাদু আম হলে মানুষ তুলে খাবে। মানুষ হল ইংরিজি আম, Mango, অর্থাৎ মানুষ তুমি পেকেছ, খসেছ, এইবার go, যাও কাঁধে চড়ে নাচতে নাচতে চলে যাও। পচা গলা নোট, হাত দিয়ে ধরতে ঘেন্না করে, তবু সযত্নে বুকপকেটে তুলি। তার ভ্যালু কমে না। যা ছাপা আছে, সেই মূল্যেই আদান-প্রদান। পচা মানুষ, দূর দূর। বিদেয় কর। সে পচা স্ত্রী মা কী বাবাই হোক। আগে পোড়া তারপর কথা। দেখ গলায় পকেটেই বা দাম কী? উপার্জনই তার মূল্য। কেউ পাঁচশো পাঁচ হাজার লাখ কী দেড়লাখ। কামাই অনুসারে দাম। যার কোনো উপার্জন নেই তার দাম শূন্য। ছাগলের সঙ্গে কম্পেয়ার কর। একশো টাকা কেজি। চল্লিশ কেজি ওজনের একটা পাঁঠা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানে চল্লিশ ইনটু একশো ইজ ইকোয়াল টু চার হাজার। চল্লিশ কেজি ওজনের বেকার। চল্লিশ ইনটু জিরো ইজ ইকোয়ালটু জিরো।

এতে দুঃখের কিছু নেই। কতকাল মানুষ আর সেন্টিমেন্টাল ফুল হয়ে থাকবে! বড় বড় আদর্শের কথা তো আর কারেনসি নোট নয়! অকর্মণ্য মানুষের বেঁচে থাকার কী অধিকার আছে! দয়া, মায়া, সম্পর্ক, মধ্যযুগীয় বোকামি। নিজের চেষ্টায় বাঁচতে পারো বাঁচো, নয় তো সট্‌কে পড়।

গাছ প্রয়োজন ফুরলে কেটে ফেলি। ছাই না হওয়া পর্যন্ত সার্ভিস দেবে। তরুণ অবস্থায় ফল দেবে, ছায়া দেবে, ভূমিক্ষয় রোধ করবে, বৃদ্ধ হলে কি মরে গেলে তক্তা হবে। কত্তা মরে তক্তা হবে না। জীবজগতের দিকে তাকাই। কুকুর কী করে! স্ত্রীকুকুর কী স্বামী কুকুরের মাথায় জলপটি লাগায়, 'ও গো, তোমার ম্যালেরিয়া হয়েছে গো!' পুত্র কুকুর কি পিতা কুকুরকে প্রতিপালন করে। 'চলো, দেড়লাখ

খরচ করে তোমার বাইপাস করিয়ে আনি।' মাকে বললে, 'চলো তীর্থ করিয়ে আনি।' জীবজগতে যে যার সে তার। সবাই পৃথিবীর টেনান্ট। লড়ে বাঁচে। বাচ্চারা সামান্য লায়েক হলেই দুধ বন্ধ। যাও বাছা! খামচা খামচি, কামড়া কামড়ি করে যতদিন পারো টিকে থাক। বেশি ন্যাকামো করতে এস না। মানুষই একমাত্র ব্যতিক্রম। পরিবার, সমাজ, আদর্শ, নীতি ধর্ম। মন দুর্বল করা যত নেগেটিভ কথা আর ব্যবস্থা। পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, ঋষি ঋণ। কিসের ঋণ। আদালতে গিয়ে দাঁড়ালে প্রমাণ করা যাবে! একমাত্র স্ত্রীঋণ গ্রাহ্য হবে। মামলা করলে টাকা দিতে হবে। ইওরোপ আমেরিকায় আজকাল বিয়ের আগেই চুক্তি। বছরখানেক পরেই ছাড়াছাড়ি হবে, তখন! মোটা টাকার ব্যবস্থা। ফেল কড়ি বাড়ি যাও। আবার বিয়ে কর। আমিও আবার আর একটা পাঁঠা ধরি। মেয়েরাই এতে লাভবান। ছেলেদের বড়ই দুর্দিন। ইওরোপ, আমেরিকায়, মা, দিদিমা, ঠাকুমা, দিদিমা, দাদু, ঠাকুর্দা নেই। সবই কাগজে-কলমে। অতি উত্তম আণবিক যুগোপযোগী ব্যবস্থা। দাও আর নাও। এক সাংবাদিক হলিউডের এক নায়িকাকে জিজ্ঞেস করলেন : দিদিমণি নবার কেন বিয়ে করলেন? অভিনেত্রীর জটজলদি উত্তর : জানিস ভাই, আমার ওয়েডিং কেক খেতে ভীষণ ভাল লাগে।

এক দম্পতি অকে রাতে একটা হোটেলের কাউন্টারে এসে ঘর চাইছেন। রিসেপশনিস্ট বললেন, 'সরি স্যার, সাধারণ ঘর তো একটাও খালি নেই। সব ভর্তি। তবে হ্যাঁ, সদ্য বিবাহিত দম্পতিদের জন্যে যে ব্রাইডালসুইট, সেটা খালি আছে।'

স্বামী বললেন, 'কিন্তু আমাদের বিয়ে যে পঞ্চাশ বছর আগে হয়েছে।'

রিসেপশনিস্টের প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। এমন টেঁকসই বিয়ে তিনি আগে কখনো শোনেননি। অভিভূত হয়ে বললেন, 'স্যার, আমি আমাদের বলরুমটা আপনাদের ফ্রি দিচ্ছি। ভয় নেই নাচতে হবে না।'

বান্ধবী জিজ্ঞেস করছে, 'তোর কিসের অভিযোগ! দেখে শুনেই তো বিয়ে করলি!'

'সে তো করলুম। বলেছিল, আমি মাল্টি মিলিয়নেয়ার।'

'মাল্টি মিলিয়নেয়ার নয়! মিথ্যে বলেছিল!'

'না টাকার দিক থেকে ঠিক আছে। বলেছিল, জেনিস, আমার

বয়েস একাশি, শরীর খুব খারাপ। আজ আছি কাল নেই। ব্যাটা জোচ্চর! বিয়ের পর আবিষ্কার করলুম, বয়েস আশি, আর একেবারে পাক্কা স্বাস্থ্য। এখন কী হবে ভাই! কত বছর টানতে হবে!'

এই পশ্চিম নতুন আদর্শ নতুন মূল্যবোধ নিয়ে আমাদের দিকে হুহু করে এগিয়ে আসছে। বিশাল বিশাল বাড়ি, কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার, ঝকর মকর গাড়ি না-ই বা হল, একটা জিনিস তো হবে—আমরা সবাই ব্যবসাদার দোকানদার হব। এক ডলারে এক কাঁচ্চা প্রেম, দশ ডলারে এক মিনিট সেবা।

এখনই মনে হবে, আহা, সেই শৈশব! এই ভয়ঙ্কর সময় থেকে পালাতে গিয়ে নজরে আসবে সেই বালকটিকে। প্রাচীন সময়ের ছায়ান্ধকার অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে হাফপ্যান্ট পরে বোকাসোকা একটি বালক। কাঁধে লেত্তি, হাতে হলুদ রঙের ভাঁটিয়াল লাট্টু। লাট্টুটা ঘোরাবার আগ আলটা জিভে ঠেকিয়ে নিচ্ছে। সবুজ মাঠে দৌড়াচ্ছে। অদূরেই সবজি বাগান। সেচের নালি বেয়ে জল চলেছে কুলকুল করে। প্রথম রোদের ঝিলিক মেখে। নালির ধারে ধারে বড় বড় ঘাস, ছোট ছোট জলশামুক, গেঁড়ি, গুগলি। চাপ চাপ বাঁধাকপি, পাতার খাঁজে খাঁজে ভোরের শিশির সঞ্চয় করে এক একটি জোতদার। লকলকে পালম শিষ তুলে নিশানা দিচ্ছে। সাদা হাঁসে চেপে বালকটির সবচেয়ে প্রিয় দেবী মা সরস্বতী আসছেন। পায়ে অঞ্জলিটি পড়ামাত্র, বড়ালদের বাগানের গাছভর্তি টোপা কুল খাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। ভোরের স্কুলের দেবীর মতো মেয়েরা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে ভোগের কপি কাটবে ঘসঘস শব্দে। ক্লাসের হাইবেঞ্চে পরীক্ষার খাতা নয়, গরম খিচুড়ির পাতা পড়বে। বোঁদে তৈরির গন্ধ আসবে নাকে।

শৈশবের সেইসব সুন্দর সুন্দর মানুষদের স্মৃতি।

তাঁদের সাজপোশাকের বালাই ছিল না। চারপকেট অলা ফতুয়া পরা অধরবাবু। পায়ে বুটজুতো। ছবি বাঁধাইয়ের কাজে বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। অতিশয় গম্ভীর মুখ। ডানপাশের বুকপকেট কাগজে কাগজে ফুলে আছে। ডান দিকের পাশ পকেটে সেই বিস্ময়কর অস্ত্র। হীরের ছুরি। বালকের বিস্ময়, না জানি কত দাম! এক একটা কাচ ফেলছেন সিড়িক করে টান মারছেন, সঙ্গে সঙ্গে দুফালা। খবরের কাগজের ওপর কাচের পাউডার ঝিলিক মারছে।

ছবি বাঁধাবার সময় চারপাশে সোনালি বর্ডার লাগাতেন। বালক

প্রশ্ন করত, 'অধরকাকু, সত্যি সোনা।' ঠোঁটে নিবে যাওয়া বিড়ি। নাচাতে নাচাতে বললেন, 'কাজের সময় ডিস্টার্ব কোরো না। মন হেলে যাবে। মাকে বলো, হাত কাপ লাইফ পাঠাতে।'

লাইফ মানে চা। তাঁর বাঁধানো মায়ের ছবি আজ দেয়ালে। সেই কাপ, সেই কাচ, সেই মা, সেই অধর আজ স্মৃতিমাত্র। সেই সবজিবাগান লোপাট। কুচো কুচো বাড়ি। অজস্র মানুষের অফুরন্ত কলরব। মানুষ আজকাল সময় পেলেই ঝগড়া করে। তখনও অভাব ছিল, অভাবের এত জ্বালা ছিল না। এখন অভাব যেন স্বভাবে চলে এসেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় ছেড়ে অপ্রয়োজনীয়ের জন্যে ফাটাফাটি, লাঠালাঠি। হল না, হল না? কী হল না? অবাক অবাক জিনিস সব হল না। সেলুলার ফোন, পেজার, টুইনটাব ওয়াশিং মেশিন, কর্ডলেস আয়রন, মাইক্রোওভেন। আমেরিকান পলিসি একালের বেপারিদের-create a need and feel you are in need. নিত্য নতুন অভাব সৃষ্টি করে ভূতের নৃত্য কর।

সব শেষে আছে সেই চির হাহাকার— যৌবন কেন নেই! যৌবনে কালীকীর্তনের দলে গান হত

একদিন উড়বে সাধের ময়না
এত যতনেও রাখিতে পারবে না
উড়বে সাধের ময়না।

ময়না উড়ে গেল লোহার খাঁচাটা থাকে। প্রাণ ময়না উড়ে গেলে, দেহ খাঁচা ভেঙে দেয়। তখন না থাকাটাই চির থাকা হয়।

লাস্ট ল্যাং

আমি এক মহাপণ্ডিত। আমি সব বুঝি। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, বিদেশনীতি। আমি বলে দিতে পারি শচীনের ওই বলটা কী ভাবে খেলা উচিত ছিল। সেইভাবে মারলেই ছক্কা। এমন কি টেনিসও আমার কবজায়। বরিস শটটা রিটার্ন করে নেটের কাছে এগিয়ে এলেই পরের বলটা মিস করত না। আর ফুটবল! ও তো সারাজীবনই খেলছি। রেগে না গেলে গোল দেওয়া যায় না। সংসারের যাবতীয় জিনিসে রেগে গিয়ে কতবার যে শট মেরেছি। সবচেয়ে মহার্ঘ শট মেরেছিলুম জীবনে একবারই। চায়ের জল ফুটতে দেরি হচ্ছিল বলে জনতা স্টোভে মারাদোনার স্টাইলে এক লাথি। পরেই দমকল এসে লালকার্ড দেখিয়ে আমাকে আর গোলকিপার আমার স্ত্রীকে সোজা হাসপাতালে। দৃশ্যটা এখনো আমার মনে পড়ে। স্টোভ গিয়ে পড়ল দেয়ালে। সেখান থেকে ছিটকে আমাদের ঘাড়ে। মুখ খুলে তেল ছিটকে উল্টেপাল্টে, অগ্নিকাণ্ড। সেই আগুনে পতির কোলে সতী। বারে বারে একই কথা বলছি, আর পুড়ছি। শীতকাল, তাই প্রথমে তাপটাকে মনে হচ্ছিল, জড়াজড়ি করে রোদে বসে আছি। কিছুক্ষণ পরেই মনে হল, সতীর চিতায় পতি। তখন বলতে লাগলুম,

'ওগো, আমরা যেন দুজনেই যাই। আমি গেলে, তুমি বিধবা হবে, তুমি গেলে আমার সশ্রম কারাদণ্ড হবে।'

সেই শিক্ষার পর এখন আর লাথি মারি না, ল্যাং মারি। প্রবাদেই তো আছে, পেলের লাথি, লিস্টনের ঘুসি, বাঙালির ল্যাং। ল্যাং যে কত ভাবে মারা যায়, সে যে জানে সে জানে। ল্যাং শিক্ষার কোনো বই নেই, গুরুও নেই। আমরা নিজেরাই শিখে যাই। ওই জ্ঞানটা আমাদের ভেতরেই আছে। ক্রমে, ক্রমে মারতে মারতে আমরা এক্সপার্ট হয়ে যাই।

বাড়িতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা তুলনাহীন ল্যাংইস্ট।

যেই বলা হল, সন্ধার মা কাল বাবা একটু তাড়াতাড়ি এস।

কয়েকজন গেস্ট আসবেন, একলা হাতে পেরে উঠব না।'

'তুমি কিচ্ছু ভেব না বউদি, দুটো বাড়ি কাল অফ করে দোবো।'

বউদি মহাখুশি বেড়ালের মাথা ঘড়ঘড় করতে করতে বললেন, 'তোমার কোনো তুলনা নেই গো। অনেক দিন ধরে একটা শাড়ি চেয়েছিলে, এই নাও সেই শাড়ি।'

সন্ধার মা পরের দিন তো এলই না, পরপর তিন দিন কামাই। বউদি নাকের জলে চোখের চলে। জোড়া গ্যাস ওভেনে, এপাশে কড়া, ওপাশে কড়া। বগ বগ করে ডাল ফুটছে একটাতে আর একটাতে চিংড়ি মাছ। বঁটি, ছুরি, কাটারি সব বেরিয়ে পড়েছে। মেঝেতে আলু গড়াচ্ছে। বেড়াল দুধের ঢাকা খুলে গোঁফ ভেজাচ্ছে। বাইরের কলতলায় কাক টেবল স্পুন নিয়ে উড়তে পারবে না বলে, টি স্পুন খুঁজছে। পালম শাক আপাদমস্তক স্নান করে শীতে হিহি করছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। সবাই এল বলে। চাল বাছা হয়নি। ধুন্ধুমার কাণ্ড। এরই মাঝে এক চিট চিটে প্রতিবেশিনী এসে হাজির। তিনি পায়ে পায়ে ঘুরছেন আর একই প্রশ্ন বারে বারে করছেন, 'কত্তার প্রোমোশান হয়েছে বুঝি! তাই এত খাওয়ার আয়োজন!'

'আরে না রে ভাই! এমনি, এমনি। ওর অফিসের কয়েকজন অনেকদিন থেকে আসব আসব বলছিল! তাই!'

'একা হাতে করছ, আমি তাহলে একটু সাহায্য করি!'

'সাহায্য করবে?' লাফিয়ে উঠলেন বউদি। 'তুমি তাহলে পায়েসটায় একটু হাতা মারো।' প্রতিবেশিনীর প্রতিভা হাতা মারতে মারতে খুলে গেল। তিনি গরম অবস্থায় আধবাটি গুড় ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুধটা ছানা কেটে গেল। বারোটা বেজে গেল পায়েসের।

বন্ধু বললে, 'অ, তোমরা ভোরের ট্রেন ধরতে চাও! ভাবনা কী, আমি গাড়ি নিয়ে আসব। নো প্রবলেম। তোমরা রেডি থেকো। ডট অ্যাট টাইম।'

বন্ধুপত্নী একেবারে গলে গিয়ে বললেন, 'সত্যি, কী ভাল, কী ভাল আপনি! পরেও ট্রেন আছে, তবে বিশ্রী সময়ে পৌঁছয়।'

'আরে, গাড়ি যখন আছে, তখন এইটুকু সার্ভিস দিতে পারব না! অপূর্ব আমার জিগরি দোস্ত!' পরের দিন, গাঁটরি গাঠরা, বেডিং, স্যুটকেস নিয়ে সবাই খাড়া। এই বুঝি আসে পার্থর গাড়ি। ঘড়ির কাঁটা ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে। গাড়ির শব্দ শুনলেই সবাই কোরাসে

বলে উঠছে, ওই এসে গেছে। কথা যখন দিয়েছে, নিশ্চয় আসবে!'

কোথায় কী, ওটা অন্য গাড়ি। ভোঁ করে বেরিয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত তিনি এলেনই না। ফোন কর, ফোন কর। সাতবারের চেষ্টায় লাইন পাওয়া গেল।

'পার্থ কোথায়?'

'লেপের তলায়।'

'সে কী! বলেছিল...!'

'বলাবলি সব নটার পর। নটার আগে তার ঘুম ভাঙে না।'

কটাস। লাইন কেটে গেল। অপূর্ব মশারির দড়ি ধরে টানছে, যেন ওটা ট্রেনের চেন। বরানগরে বসে টানলে হাওড়ার ট্রেন থেমে যাবে।

প্রশান্তর মেয়ের বিয়েটা বেশ পেকে এসেছিল। ছেলেটি খুবই ভাল, ইঞ্জিনিয়ার। তেমন খাঁইও নেই। দিন, ক্ষণ প্রায় ঠিক। সুশান্ত এসে ছেলের বাপকে বললে,

'বিয়ের পর তোমরা কোথায় থাকবে!'

'কেন? এ প্রশ্ন কেন? আমরা এক সঙ্গেই থাকব।'

'পারবে তো?'

'সে আবার কী কথা!'

'না, কথা তো ওই একটা। পার্টি করা মেয়ে। একটা নয় একশোটা বন্ধু। ঢুকে যখন হল্লা করবে, তখন যাবে কোথায়! আর একটা আস্তানা তো চাই।'

ব্যস হয়ে গেল। সানাই গেল ফেঁসে। প্রশান্ত বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা কী হল। এক বাঙালির ভাল কিছু হলে, আর এক বাঙালির খুব কষ্ট হয়। বুক ফেটে যায়। অমূল্যবাবুর ছেলে চাকরি পেলেন, সেই শুনে জগন্নাথবাবুর হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল।

ভগবান বললেন, 'বৎস! অতিশয় প্রীত হয়েছি, তোমাকে বর দিতে চাই; তবে একটা কথা। তুমি যা পাবে, তোমার প্রতিবেশী পাবে তার দ্বিগুণ। বল, তুমি কী চাও?'

ভেবেচিন্তে বললে, 'প্রভু! আমার একটা চোখ কানা করে দিন।'

'এটা একটা বর হল?'

'আমি আপনার কাছে ভাল কিছু চাইলে আমার প্রতিবেশীর ডবল ভাল হয়ে যাবে যে। তাই একটা চোখ দান করে দিলুম, তাহলে

আমার প্রতিবেশী সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাবে, কী মজা!'

সুইচে হাত দেওয়া মাত্রই হাতটা চিন করে উঠল। পুরো লাইন শর্ট হয়ে আছে। থাক ওই রকম। একা আমি কেন মরি, তোমরাও মর।

তুমি পয়সা খরচ করে বাগান করবে! আমি একজোড়া ছাগল কিনব।

তুমি তোমার জানলায় বাহারি কাচ লাগাবে! আমি পাড়ার ছেলেদের ডিউস বল কিনে দেবো।

তুমি শান্তিতে থাকবে, আমি টু হান্ড্রেড ওয়াটের মিউজিক সিস্টেম বাজাব।

তুমি তোমার বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার রাখবে, আমি আমার বাড়ির সব জঞ্জাল ডাঁই করে দিয়ে আসব।

তুমি পুকুরে মাছের চাষ করে বড়লোক হবে ভেবেছ! আমাদের ফলিডল আছে।

তুমি কারখানা খুলেছ? আমরা ঝাণ্ডা উঁচিয়ে বন্ধ করার জন্যে তৈরি আছি।

তুমি সমাজসেবা করে নাম করবে! আমরা তোমাকে চোর প্রমাণ করব।

একবার নির্বাচনে ভোটপ্রার্থী হয়ে দেখ, তোমার কত কলঙ্ক আমরা রচনা করে দিতে পারি!

ভাইয়ে ভাইয়ে খুব মিল! একত্রে সুখে আছ? দাঁড়াও ফেঁড়ে দিচ্ছি।

বাজার করে বাড়ি ফিরছ, মনটা তাহলে বিষিয়ে দি :

'কী! ছেলে থাকতে আপনি?'

'ও একটু দেরিতে ওঠে, তা ছাড়া এটা আমার অনেক কালের অভ্যাস, ভাল লাগে, মর্নিংওয়াকও হয়!'

'দেরিতে ওঠে কেন?'

'চাকরিটা তো সাংবাদিকের; ফিরতে দেরি হয়।'

'লক্ষ্য করে দেখেছেন?'

'কী বলুন ত।'

'সকালে সানগ্লাস, ভুঁড়িটা চড় চড় করে বাড়ছে, সন্ধেবেলা জরদাপান, এই তিনটে কিসের লক্ষণ, জানেন?'

'আজ্ঞে না।'

'বোতলের। বোতল ধরেছে। আর আপনি এই বুড়ো বয়েসে ছানি পড়া চোখে বাজারে গুঁতোগুঁতি করছেন! এই হল কলিকাল! মাথায় যে হনুমান টুপিটা চাপিয়েছেন, বউমা একটু কেচে দিতে পারে না!'

'তারই বা সময় কোথায়! একা হাতে সংসার!'

'এ ছাড়া কী আর বলবেন! শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। শান্ত বিচারে দেখবেন, খুঁজে পাবেন সত্য! ইউ আর নেগলেকটেড। আপনি হলেন গিয়ে, আনারারি সার্ভেন্ট।'

'আমার তো এসব মনে হয় না!'

'ইউ আর এ ফুল।'

বেশ বসেছিলেন ভদ্রলোক। চা বিস্কুট খাচ্ছিলেন। বন্ধু জ্যোতিষী এসে বললে, 'তোর ছকটা আমার কাছে ছিল।'

'কী দেখলি, কী দেখলি?'

'তাই তো ছুটে এলুম। তোকে একটু সাবধান করতে এলুম, যতই হোক, তুই আমার বন্ধু।' কাপ কেঁপে গেল, চুমুক আটকে গেল। কাঁপা কাঁপা প্রশ্ন :

'খুব খারাপ সময়!'

'যাকে বলে নিদারুণ দুঃসময়। নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়বি। এতকাল যা রোজগার করেছিস সব উড়ে যাবে, বিরাট এক দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যাবি।'

'তারপরে কি মরে যাব?'

'সে হলে তো হয়েই যেত। তোর পরমায়ু অনেক। তোকে মারবে না, ভোগাবে।'

'উপায়!'

'তোর বাড়িতে তো একটা ছোট সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম আছে!'

'আছে।'

'সেইটা গলায় বেঁধে ঘুরে বেড়া। অভ্যাস কর।'

'কী অভ্যাস।'

'ওইটা নিয়েই তো পথে নামতে হবে, মা, আমায় ঘুরাবি কত..বাবা, দুটো পয়সা।'

এই হল লাস্ট ল্যাং।

ধর্ম ও লিভার

নিজের দুটো হাত দিয়ে যে নিজের পিঠের পুরো নাগাল পায় না, সে ধরতে চায় পৃথিবীর যত সুখ সম্পদ। অনন্ত যৌবন চাই, অতুল বিত্ত, বৈভব চাই, দোর্দণ্ড প্রতাপ চাই, হাতে মাথা কাটার ক্ষমতা চাই। নিজের পেছন দিকটা যার দেখার ক্ষমতা নেই, সে পাগলের মতো সোনার হরিণের পেছনে ছুটছে। ওরে থাম। পাগলা কার পেছনে ছুটছিস! তোমার পেছনে পায়ে পায়ে কে অনুসরণ করে আসছে একবার দেখ। তোমার ঘাতক। তোমার মৃত্যু।

এই সব আদিখ্যেতার কথা একটা বয়েসের পর মানুষ বলবেই বলবে। কারণ মানুষ তখন একটু ধর্মধর্ম ভাব আনতে চায়। বিউটিসিয়ান দেহত্বক দেখে প্রশ্ন করলেন, কত হল!

-এই যাচ্ছে। তিরিশ টপকে চল্লিশের চৌকাঠে।

-এজিং শুরু হয়ে গেছে। কপালে বলীরেখা। গলাটা হোসপাইপের মতো ভাঁজ ভাঁজ। হাতে টোড স্কিন। ফেসিয়াল করুন। সত্তর রকমের স্কিন টনিক আছে, ব্যবহার করুন। প্রচুর জল খান, ফল খান। যোগাসন, শবাসন চালান। মুখ থেকে বিরক্তির ভাবটা দূর করুন। তাহলে বয়েসটা কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন। জেনে রাখুন, সবই হল লিভার।

-মানুষ বলে কিছু নেই!

-একশো কোটি মানুষ মানে একশো কোটি লিভার, হার্ট কিডনি, থাইরয়েড। একশো কোটি মুণ্ডু। কোনোটায় কাউ ডাং, কোনোটায় মেধা। লিভার একটা মোস্ট ইমপর্টেন্ট সেকটর। মুখ মানে কী! ডায়াগ্রামটা লক্ষ্য করুন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। চুল বনমানুষের উত্তরাধিকার। কপালে হনুমান। মেয়েদের চোখে হরিণ। ছেলেদের চোখে হাতি। নাক হল দুটো ফুটো, বাতাস যাবে, তলায় পাইপ বুকের দুপাশে দুটো বেলুন। যেই বাতাস টানবে ফোঁস করে ফুলবে। যেই ছাড়বে অমনি ফুস করে চুপসে যাবে। মাঝখানে বাঁ দিকে ঘেঁসে

শক্তিশালী একটা পাম্প টিপ টিপ করে রাজপথের মিছিলের স্লোগান দিয়েই চলেছে, 'চলছে, চলবে।' হঠাৎ একদিন বলে বসবে, 'চলছে না, চলবে না।' ব্যস! লক আউট। ঝাণ্ডা উড়ে গেল। সব কলকব্জা স্তব্ধ। ইন্দ্রিয়ের ইঁদুর, ছুঁচো সব হাওয়া। অন্যে সব কবে কথা, তুমি রবে নিরুত্তর।

-আবার সেই মাথার কথা এসে যাচ্ছে কিন্তু! ঘুরেফিরে সেই এক কীর্তন, কে তুমি কী হেতু এলে।' ওপর দিকে ওঠার চেষ্টা, যেখানে সাঁই সাঁই বাতাস ছাড়া আর কিছু নেই। চারতলায় উঠতে গেলেই হাঁপ ধরে, লিফ্‌ট, লিফ্‌ট চিৎকার, অনন্ত! সে যে বাবা আমেরিকার রকেট চাই। তাতেও হবে না। যত যাই, তারপরে আরো আছে। যাচ্ছি তো যাচ্ছি, যাচ্ছি তো যাচ্ছি, যাচ্ছিই যাচ্ছি। তারই মধ্যে মরে গেছি। ষাট, সত্তর বছরের পরমায়ু নিয়ে ষাট কোটি আলোক বৎসরের পথ পাড়ি দেবার চেষ্টা। রকেটের ক্যাপসুলে ঠকঠকে একটা কঙ্কাল। কৌটোর ভেতর সুপুরি। একবার এদিকে গড়াচ্ছে, একবার ওদিকে গড়াচ্ছে। যাচ্ছে কোথায়? অনন্তের অন্ত খুঁজতে। গাধা কোথাকার!

-অ্যায়, এই কথাটাই সার কথা। গাধা। গাধার লিভার মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। আর গাধার দুধ নেক্সট টু মাদারস মিল্ক। কোনো কারণে মা মারা গেলে সদ্যোজাতকে ওই দুও খাওয়ানো যায়।

-গাধার আবার, দুধ হয় না কী?

-কেন হবে না! গাধার বাচ্চারা তাহলে খাবে কী! বেবি ফুড। শোনো, লিভার আর ধর্ম এক বস্তু।

-সে আবার কী, অমন কথা আগে শুনিনি।

-বিচার করলে বুঝবে। লিভার খাদ্য হজম করায়। ধর্ম হজম করায় সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শঙ্কা, আশঙ্কা। দেহের লিভার লিভার, মনের লিভার ধর্ম। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মতো লিভার ধর্ম কোথায় জানা নেই, তবে সেটাকে চাঙ্গা করতে পারলে মাথার মধ্যে একটা কাজ হয়, জাগতিক বোধ চলে যায়। এ কথা গীতায় শ্রী ভগবান বলছেন, সত্যি সত্যি হয় কী না, আমি জানি না।

-ও বুঝেছি, ওই শ্লোকটা, দুঃখেস্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয় ক্রোধঃ স্তিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ গত চল্লিশ বছর ধরে নাগাড়ে

এই শ্লোকটা দুলে দুলে, সুরে সুরে বলি। আমার একটা খাতা আছে। লেখা আছে কোটেবল সব কোটস, যেমন আর একটা, ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে। তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবামভসি।

-দুটোকে মিলিয়ে কী লিভার পেলে? লিভারের আর একটা মানে জান কী! যা দিয়ে ভারি কোনো বস্তুকে তোলা যায়। মনের চেয়ে হালকা, আবার মনে চেয়ে ভারি জগদ্দল আর কিছু নেই।

-দুটোকে লিমিয়ে যা পেয়েছি তা হল, যাবতীয় সংসার দুঃখে উদ্বেগশূন্য হও। ছেলে ফেল করেছে, মরুক গে, ও কার ছেলে! বউয়ের ছেলে। মরে যাচ্ছে যাক। জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। চাকরি চলে গেছে! হাঁড়ি চড়বে না! কলের জল তো আছে। আর একটা সাংঘাতিক কোট আমার খাতায় ঝুলছে। মরণোন্মুখ রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রী শুকদেব বলছেন, সব লাটে উঠে গেলে, আমরা আমাদের অর্থগত, অনুগত, লটাপটি খাওয়া এই জীবনের দিকে চ্যালেঞ্জের মতো ছুড়ে দিতে পারি। শ্রী শুকদেব রাজাকে বলছেন :

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাস্মি পাঃ পরাভৃতঃ সরিতোহপ্যশুষ্য।
বুদ্ধা গুহান কিমজিতোহবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান ॥

-এ তো তোমার সংস্কৃতের থান ইট হে। বাঙলা ভাষাই যেতে বসেছে, তুমি ঝাড়ছ সংস্কৃত। বম্বে গেছ?

-না শুনেছি নাম পালটে মুম্বাই হয়েছে। বড় বড় মাফিয়াদের দ্বারকা।

-আরে ইয়ার, বোম্বাই না যাও, বোম্বাই সিনেমা তো দেখছ! ওই হল ভারত ভাষা, ভারতীয় জীবনের লাইল স্টাইল। পেয়ার..পেয়ার! ছাত থেকে ঝাঁপ। ঠিক সেই সময় মহা মহা প্রেমিক শ্রী ভবান মুম্বাইগীর জন্যে ব্যস্ত রাজপথে একটি খড়ের গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। নায়ক ঝপাং করে পড়ামাত্রই, বন থেকে বেরল টিয়ের মতো খড় ঠেলে উঠবে শ্রীময়ী। শুরু হয়ে যাবে ধিতিং ধিতিং। ওদিকে মাফিয়া মামাশ্রী তার দলবল-সহ হাজির। এত অস্ত্রশস্ত্র আমাদের সমরকোষেও নেই। নায়ক এক হাতে করবে প্রেম, আর এক হাতে ফাইট। গান চলছে, ঠাস ঠাস চলছে। মাফিয়াশ্রীর চোখে সানগ্লাস, নিভাঁজ স্যুট, হেঁড়ে গলায় বলছে, তু সে জিন্দা নেহে ছোড়ুঙ্গা। চারদিক থেকে চল্লিশটা মাস্তান

স্টেনগান চালাচ্ছে। নায়ক আমাদের পারফেক্ট শ্রীকৃষ্ণ। একটা বোতল ছুড়ে মামা কংসকে মেরে, পেয়ার, পেয়ার বলে নাচতে নাচতে নায়িকাকে নিয়ে কুঞ্জে চলে গেল।

-কোথা থেকে কোথায় গেল। হরিদ্বারে রাজা পরীক্ষিত মহর্ষি শুকদেব এসেছেন ভাগবত শোনাতে, সেখান থেকে নিমেষে বোম্বাই!

-এই হল মন ভাই। ভেপারের মতো। যাক শ্লোকের অর্থটা বল, যদি একটু বল আসে মনে!

-মাটি যখন আছে মহারাজ, পৃথিবীজোড়া পাতা, তখন শয্যার কি বা প্রয়োজন! দেহের সঙ্গেই তো দুটি বাহু সংলগ্ন, তাহলে বালিশ খুঁজে মরি কেন। অঞ্জলি থাকতে নানাবিধ ভোজন পাত্রের কোনো প্রয়োজন আছে? দিক্ আছে বল্কল আছে, তাহলে আবার কাপড় কেন? মহারাজ পথে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়ে থাকে না! আমাদের ভরণ পোষণের জন্যেই তো এত বৃক্ষ। তারা কি এখনো প্রার্থীকে আর ভিক্ষা দেয় না? মহারাজ, সমস্ত জলাশয় কি শুকিয়ে গেছে। পর্বতের গুহাগুলি কি সকলই রুদ্ধ? শ্রীহরি শরণাগতকে কি আর রক্ষা করেন না? সুধিগণ কেন তবে ধনমদে অন্ধ মানুষদের উপাসনা করেন? কি প্রয়োজন!

-সব মিলিয়ে তাহলে কি দাঁড়াল।

-সুখে হ্যা হ্যা করে হাসব না দুঃখে হাঁউমাঁউ করে কাঁদব না। স্ত্রী যতই দংশন করুক এতটুকু রাগ করব না।

-ভাবব প্রেমের ভ্রমর। ঠোঁটে হুল থাকলেও পায়ে আছে পদ্মরেণু।

-মনে নেই, জয়দেবের কেস! কিছুতেই শ্লোক মিলছে না। খাতা খোলা রেখে স্নান করতে গেলেন, সেই সময়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কবির রূপ ধরে এলেন। কবির স্ত্রী অবাক, এ কি স্নান না করে ফিরে এলে? জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দাঁড়াও দাঁড়াও। শেষ চরণটা মাথায় এসে গেছে। প্রবাদে এমনও আছে, জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ স্নান শেষ করেই এসেছিলেন। কবিপত্নী পদ্মাবতীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে জয়দেব রোজ যে ভাবে নিত্য পূজাদি করতেন, ঠাকুরঘরে বসে সেই সব করলেন। তারপর ভোজনান্তে শোবার ঘরে গিয়ে বিশ্রামের জন্যে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। পদ্মাবতী তাঁর পাদসংবাহন করে রান্নাঘরে এসে প্রসাদান্ন নিয়ে সবে আহারে বসেছেন, তখনই এলেন প্রকৃত জয়দেব। দুজনেই বিমূঢ়। শ্রীকৃষ্ণ ততক্ষণে শয্যা ছেড়ে চলে গেছেন।

ঘরে পড়ে আর তাঁর দুষ্টু দুষ্টু হাসিটি। জয়দেব লিখে গিয়েছিলেন, স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং। কলম থেমে গেল। কবির মহাসংশয় : কৃষ্ণ চাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে। কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় এই চিতে॥ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সংশয়ের অবসান করে পাদপূরণ করে দিয়ে গেছেন স্বহস্তে—দেহিপদপল্লবমুদারম্। চোখে আমার জল এসে যাচ্ছে ভাই। ভেতরটা রাধা রাধা করছে।

-অই, লিভার দুর্বল হলে, শরীর দুর্বল হয়। যা খাবে বদহজম, অ্যাসিড। ক্ষণ শরীরে অসুস্থ মন। হাতাশা, মৃত্যু, চিন্তা, পরা আবেগ, প্রেমাশ্রু। প্রেমিক কোথায়। নাও, আমি এই সোফায় ধপড়, ধপড় তাল বাজাচ্ছি, তুমি কদম কদম সুরে গাও :

'ফ্ল্যাট চাই, ফোন চাই, ফ্রিজ চাই, টিভি চাই, গাড়ি চাই, ছেলের একটা লাগদাঁই চাকরি চাই। কদম কদম বাড়ায়ে যাই। মেয়ের জন্যে এন আর আই জামাই চাই।'

অ্যান্টাসিড আছে? তখনই বলেছিলুম, টোস্টের ওপর চা চড়িয়েছ কী মরেছ॥

অভিমান

অভিমান খুব সাংঘাতিক জিনিস। অন্য কোনো ভাষায় এর যথোচিত প্রতিশব্দ নেই। সেন্টিমেন্ট, সেন্টিমেন্টাল অন্য ব্যাপার। বেগুনি ফুলুরির মতো এটি সম্পূর্ণ বঙ্গজ। রাগে সর্বশরীর জ্বালা করে। ঝড়ের মতো এল সব লণ্ডভণ্ড করে চলে গেল। আবার রোদ উঠল, নীল আকাশ বেরলো, পাখি ডাকল। অভিমান কিন্তু তা নয়। মেঘলা আকাশে মেটে মেট রোদ, না ঝড়, না বৃষ্টি। মনের ভেতরে কী একটা হতে থাকে। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি। ঢেঁকুর আটকে গেলে যেমন হয়। ফ্ল্যাগে হাত মাস্ট হয়ে যাওয়ার মতো। রাগের কনস্টিপেসানকে অভিমান বলা যাবে কী! না মনে হয়। চাপা ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ভিন্নতর।

উদাহরণ, খেতে বসেছি। ভাত বেশি হয়েছে। পাতে পড়ে থাকাটা ঠিক নয়। মোলায়েম করেই বললুম, 'দুটি তুলে নেবে গা!' এক মুঠো তুলে নিয়ে গেল। যেতে না যেতেই, আবার অনুরোধ, ডাল একটু কমিয়ে দেবে।' বাটি চলে গেল, ফিরে এল হাফ হয়ে। হঠাৎ মনে হল, পালমশাক এতটা খাওয়া ঠিক হবে না। অ্যামিবায়োসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস। এইবার বললুম, 'শাকটা তুলে নিয়ে যাও। শাক না খাওয়াই ভাল।'

রান্নাঘরে তখননো মাছের কেরামতি শেষ হয়নি। ওটা আমারই পাতে আসবে। ইতিমধ্যে বার তিনেক আসা-যাওয়া হয়েছে। সেই চাপা ক্রোধের প্রকাশ হল এই ভাবে, ঝাঁ করে এসে সাঁ করে থালাটা তুলে নিয়ে চলে গেল। পড়ে থাকলুম আমি আর জলের গেলাস।

এর নাম ক্রোধ। এই যে এক কাজ করতে করতে, বারে বারে আসা হুকুমের পর হুকুম। বাক্যে কিছু প্রকাশ পেল না, প্রকাশিত হল কাজে। থালাটাই চলে গেল। পাকা সংসারী হলে, সে কি করত, যা পরিবেশিত হয়েছে, সুবোধ বালকের মতো সবটাই খেয়ে উঠে যেত। অসুস্থ হলে ডাক্তারবাবু মেরামত করে দিতেন।

গ্রীষ্মকালে বারে বারে জল চাওয়ার এই পরিণতি হয়েছিল, গোটা

জলের কুঁজেটাই টেবিলে চলে এল. কত খাবে খাও। স্বামী না হয়ে সন্তান হলে এই কথাটাই শুনতে হত, নাও গিলে মরো। একবার জামা চেয়ে কী বিপদ। প্রথমে এল সরষে ফুল রঙের একটা জামা।

-এটা কেন দিলে। একে কালো, এটা পরলে আরো কালো দেখাবে।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশি নীল রঙের একটা জামা এল।

-এটা দিলে কেন? আর কিছু নেই! এটা পরলে বড় রোগা দেখায়।

সঙ্গে সঙ্গে এল একটা সাদা জামা।

-সাদা! মরেছে এত পরতে না পরতেই কালো হয়ে যাবে।

এইবার যা হল কহতব্য নয়। যত জামা ছিল সব এসে গেল। স্টিলের আলমারির পাল্লা ধড়াস করে বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধের শব্দেই বুঝিয়ে দিলে, স্ত্রী রাগিয়া গিয়াছেন।

একদিন চায়ে চুমুক মেরে বললুম, 'চিনি নেই না কী।'

-কেন কী হয়েছে!

-একেবারে মিষ্টি হয়নি।

-তা হলে তলায় বসে আছে। গুলিয়ে নাও।

ডটপেনের উলটো দিক দিয়ে গুলিয়ে, চুমুক দিলুম।

-কোথায় চিনি! দিতেই ভুলে গেছ।

এইবার পায়ের শব্দ। দুম দুম। এক হাতা চিনি থপাস করে চায়ে। টিস্পুন, টেবল স্পুন, ডেসার্ট স্পুন শুনেছি, হাতা যদি চামচে হয় তাহলে কী ইংরিজি হবে—ল্যাডল স্পুন! কথা কাটাকাটি করে স্ত্রীকে ক্ষিপ্ত করে কোনো মানুষ সুখী হতে পারে না। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া চলে না। এই জ্ঞান যার নেই তার সংসার করা উচিত নয়।

শৈশবের কথা মনে পড়ছে। রবিবার, রবিবার দুপুরে আহারাদির পর বাবা উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলতেন, কোমরে দাঁড়া। সায়েটিকা ছিল তাঁর। বেশ করে মাড়িয়ে দিলে আরাম পেতেন। তিনি আরাম পেতেন ঠিকই! পুত্র হিসেবে পিতার সেবা অবশ্যই করা উচিত; কিন্তু আমার ভয়ঙ্কর রাগ হত। ছুটির দুপুরে একটি শিশুর কত আকর্ষণ কত দিকে। গল্পের বই, ঘুড়ি, লাট্টু, গাছতলায় ছড়ানো ফলসা, কচি আম। পুকুরের পাড় দিয়ে পোড়ো ভিটের পাঁচিল টপকে, শিবমন্দিরের

ঘাটে গিয়ে সঙ্গী-সাথীদের খুঁজে বের করে, দুপুরটাকে পড়ন্ত বিকেলের কোলে তুলে দেওয়ার যে কী আনন্দ, সে শিশুই জানে।

যন্ত্রণাকাতর বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন, ডান দিক, বাঁ দিক, ওপরে, আর একটু ওপরে। জোরে আর একটু জোরে। আস্তে, আস্তে লাফা। এক রোববার রেগে গিয়ে অ্যায়সা লাফালুম, স্লিপ ডিস্ক। এরপর আর কখনো বলেননি। এখন, জীবনের এই পড়ন্ত বেলায়, ছায়ায় বসে ভাবি, আর তো সেবা করার সুযোগ পাব না। এখন প্রণাম করার মতো কেউ আর জীবিত নেই।

ক্রোধের মতো কুৎসিত জিনিস আর কিছু নেই। তবু আমরা রেগে যাই। রাগের কারণে সব যখন কেঁচে যেতে থাকে, বন্ধুরা শত্রু হয়। পরিবার-পরিজন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, তখন আমরা একটা ছুতো খাড়া করি, সেটা হল হাই ব্লাড প্রেসার। কী করব ভাই, আমার যে হাই প্রেসার। কখন যে কী বলে ফেলি। রাগটাকে প্রেসার বলে চালাতে পারলে সাতখুন মাপ। অফিসে বড়কর্তা যা খুশি তাই বলেন। দুর্মুখ। ইউনিয়নকে বলে, ধরে পিটিয়ে দিলেই লেঠা চুকে যায়। কিন্তু, এ মুখ সে মুখ নয়। এ হল প্রেসারের মুখ। মেপে দেখা হয়নি, তবে রটনা সেই রকমই। তিনি প্রেসার কুকার। মাঝে মাঝেই স্টিম ছাড়বেন। মাসের শেষে টাকাটি বুঝে নেবার জন্যে দিনের পর দিন সহ্য করতেই হবে।

গৃহে কর্তার হাইপ্রেসার। সবাই তটস্থ। এই বুঝি সেরিব্র্যাল হয়ে যায়। শুধু রোজগার বন্ধ নয়, বিছানায় পড়ে থেকে বাম্বু। না যায় ফেলা, না করা যায় সেবা। ছেলে, মেয়েরা উড়ে বেড়াবে। কোণের ঘরে কর্তা কুপোকাত। টেঁসে গেলে আমরা বল হরি করার জন্যে সাইড লাইনে আছি। ঝপাঝপ সেরে দোবো। খাট, ফুল, ধূপ, চারটে কাঁধ, দেড় কেজি ছাই, ভুল মন্ত্রোচ্চারণে পিণ্ডোৎসর্গ, গঙ্গা লেখা কার্ড, শ্রাদ্ধ, নিয়মভঙ্গ, মুণ্ডিত মস্তকে এক মাসেই চুল গজিয়ে যাবে। পিতা ছিলেন, পিতা জড়বৎ ছিলেন, পিতা নেই। পিতাদের এই রকমই পরিণতি। জাতির পিতা, পরিবারের পিতা, সব পিতারই এক হাল। ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে, অর্থাৎ মৃত্যু ঘুমিয়ে আছে। তুমি পিতা হবে, তুমি স্বর্গে যাবে। তোমারও আনন্দ আমাদেরও আনন্দ। পিতা মানেই গণ্ডার। মোটা, পুরু, ঘাতসহ, অনুভূতিহীন চামড়াটি তৈরি করে দেবেন পিতার স্ত্রী অর্থাৎ মাতা। সন্তান

প্রতিপালনের সৎ দায়িত্বে তৈরি হবে নাসিকা খাড়া। অতঃপর শুধু গুঁতিয়ে যাও। গুঁতোগুঁতির নামই সংসার।

গীতায় ভগবান বলছেন :

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥
এটিকে বাস্তবানুগ করলে এই রকম হবে :
ক্রোধাদ্ভবতি হাই প্রেসারঃ প্রেসারাৎ সেরিব্র্যালঃ।
সেরিব্র্যালাৎ প্যারালিসিসঃ চিতায়াং চড়িতং জড়সাবঃ ॥

অভিমান কিন্তু ক্রোধগণ্ডার নয়। কবিতার মতো সূমে বিচরণ। সেতারের ভাষায় মীড়ের কাজ। ছেলেকে বলেছিলেন, পিতার হোটেলে খাচ্চ দাচ্ছ এইবার একটু রোজগারের চেষ্টা দেখ। মাসখানেক পরে জানা গেল, ছেলে মোড়ের দোকানে বসে পাঁউরুটি আলুর দম খায়। বলেছে,. মিত্তির মশাইয়ের অন্ন স্পর্শ করবে না। ছেলের দিকে গর্ভধারিণী। তিনিও একমাস চা আর লেড়ো বিস্কুটের ওপর আছেন।

কবে কখন রাগের মাথায় স্ত্রীকে বলে ফেলেছিলুম, কে তোমাকে খাওয়াচ্ছে। যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙছ দাঁতের গোড়া।

মাসখানেক পরে কাজের মহিলার কাছ থেকে জানা গেল তারই ভাষাতে, 'বেধবা হবার ইচ্ছে হয়েছে দাদাবাবু।'

'কেন রে, আমি বেধবা হতে যাব .কোন দুঃখে!'

'দিদিমণি তো টালার ট্যাঙ্ক হয়ে গেল।'

'তার মানে?'

'একমাস তো জলের ওপরেই আছে।'

'সে কী রে, আর কিছু খাচ্ছে না!'

'সেই যে বলেছিলেন, কে তোমাকে খাওয়াচ্ছে! কে কাকে খাওয়ায় দাদাবাবু, সবাই নিজের ভাগ্যে খায়। খাঁওয়ার খোঁটা কক্ষুনো দিবেন না। আমি আমার কত্তাকে সব বলি; কিন্তু খাওয়ার খোঁটা দি না। যা শিক্ষে হয়েছিল!'

'কী শিক্ষে!'

'এইবার রাগের মাথায় বলেছিলুম, তা ভাতের বদলি এক বোতল অ্যাসিড খেয়ে বসে রইল। ভাগ্যে আমার বেধবা হওয়া নেই, তাই আজও টেনে যাচ্ছি সাত বাড়ি কাজ করে। সবাই ভাগ্যে খায় দাদাবাবু। আপনার ভাগ্য ভাল বৌদিমণি শুধু জলই খাচ্ছেন, অ্যাসিড খেলে

কী হত! কোমরে দড়ি। তার আগে কেলাবের ছেলেরা পিটিয়ে পাট করে দিত। জানেন না, স্বামীকে হত্যা অতটা দোষের নয়, বধূহত্যা মহাপাপ।'

অফিস থেকে ফেরা মাত্রই এক কাপ চা আসে, সঙ্গে কাপের ব্যাকগ্রাউন্ডে স্ত্রীর হাসি মুখ। দাম্পত্য জীবনের ফার্স্ট, সেকেন্ড এমন কী থার্ড ইয়ার পর্যন্ত এমনই চলে। পোস্ট গ্রাজুয়েটের পর এসব আর থাকে না। ছাত্র জীবন শেষ। তখন ইঞ্জিনিয়ার। সংসার যন্ত্রের তেল কালি মাখা মেকানিক।

সেদিন চা এল না। স্ত্রীর বান্ধবীরা এসেছে। হ্যা হ্যা, হা হা। রাগ নয় অভিমান। জামা জুতো পরে বেরোচ্ছে। স্ত্রী একবার ক্যাজুয়ালি প্রশ্ন করলে, এসেই আবার চললে কোথায়! দেরি কোরো না কিন্তু!' চায়ের কথা হল না।

অভিমান পাকল আরো। পাড়ার দোকানে মোটা গেলাসে চা সেবন হল। দোকানদার প্রশ্ন করলে,

'ধনাদা গ্যাস ফুরিয়ে গেছে বোধ হয়।'

'হ্যাঁ ভাই, গ্যাস ফুস্।'

এইবার কোথায় যাওয়া যায়! সিদ্ধেশ্বরী কালীতলার চাতালে।

'মা, তুমি ছাড়া কেউ নেই গো মা!'

'বাবা! এইটি তো তোমার মনে থাকবে না বাছা। এ তো তোমার চায়ের বৈরাগ্য। চার চুমুকেই শেষ। সোহাগে মৃণালভুজে যখন বাঁধবে মা তখন পাথর। তবে বলি শোনো, অভিমান পাকা হলে মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর দর্শন হয়। রামপ্রসাদের হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের হয়েছিল।'

হঠাৎ শোনা গেল, 'এই তো! বউদি, দাদা এইখানে।'

পরের দৃশ্য, অভিমানীর বুকে অভিমানিনীর মাথা।

মা হাসছেন, বৎস! এরে কয় প্রেম। বটপাতার আঠা!

পলায়ন নয় সম্মুখ সমর

তখন সকাল! স্থান কাশী। এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী দুর্গামন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। হাঁটছেন তিনি। কাশীর গলি। অপরিসর। হঠাৎ নেমে এল একপাল বানর। তারা সন্ন্যাসীর পিছু নিয়েছে। সন্ন্যাসী ছুটছেন, বানরের পালও ছুটছে। এমন সময় এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী চিৎকার করে বললেন, থামো, থামো ছুটো না, রুখে দাঁড়াও। সন্ন্যাসী সাহসভরে ফিরে দাঁড়ালেন। বানররা প্রথমে থমকে দাঁড়াল, তারপর ছুটে পালাল।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন, এই ঘটনা আমাকে একটি মহৎ শিক্ষা দিয়ে গেল, রুখে দাঁড়াও। বিঘ্ন কিংবা বিপদ দেখে কখনও পালিও না। নির্ভয়ে মুখোমুখি দাঁড়াও। পরবর্তীকালে নিউইয়র্কে একটি বক্তৃতায় স্বামীজি এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন-'এই হল সারাজীবনের জন্য একটি শিক্ষা -ভয়ঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়াও, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হও।' Face the terrible face it boldly. স্বামীজি বলছেন, Like the monkeys, the hardships of life fall back when we cease to flee before them. জীবনের প্রকৃত স্বাধীনতা যদি আমরা পেতে চাই, তাহলে প্রকৃতিকে জয় করতে হবে, ছুটে পালালে চলবে না। পালিয়ে তুমি যাবে কোথায় বৎস! দেহ ছেড়ে পালানো যায়! প্রাণ যে খাঁচার অধিবাসী! তাহলে প্রাণটাকে মেরে ফেল, তার নাম আত্মহত্যা। পরাজয়। স্বামীজি বলছেন cowards never win victories লড়তে হবে ভয়ের সঙ্গে, সমস্যার সঙ্গে, অজ্ঞতার সঙ্গে, if we expect them to flee before us.

একথা ঠিক বেঁচে থাকার মতো কঠিন কাজ আর নেই। Life is difficult. একটা করে দিন যায় সমঝে দিয়ে যায় চব্বিশটা ঘণ্টা কোনো রকমে কাটল। জীবনের দিন থেকে ওয়ান মাইনাস হল। দেহের কলকব্জা আরো একদিন পুরনো হল। বিশ্রী দগদগে ঝাঁজাল সূর্যটা আবার উঠবে। খ্যা খ্যা করে কাক ডাকবে। মরচে ধরা গ্রিল ফুঁড়ে এক চিলতে রোদ ঢুকবে সংসারে। চারপাশ এলোমেলো। টেবিলে,

চেয়ারে, মেঝেতে একপর্দা ধুলো। গুচ্ছের কাপড়, কাগজ, বাক্স প্যাঁটরা। ধ্যাধ্ধেড়ে গোটা কতক আলমারি। র‍্যাকে কিছু বই। একটার ওপর আর একটা হেলে আছে। ধুলোমাখা জ্ঞানের থান ইট। কেউ পড়ে না। কখনই পড়বে না। ভাত-কাপড়ের যোগাড় আর গাল গল্প করতে গিয়েই সব শক্তি ফতুর। এই দৃশ্যেই প্লেটের গাড়ি চেপে চায়ের কাপ আসবে টাল খেতে খেতো খানিকটা গরম জল। কদাকার স্বাদ। হয় চায়ের গুঁড়ো, না হয় একটা ছোট পিঁপড়ে ভাসবেই ভাসবে। যে হেতু স্বাস্থ্যের নিয়মে আছে খালি পেটে চা খেতে নেই। লিভার দরকচা মেরে যায়। কাপের কোনো একটা জায়গায় কড়কড়ে একটা কিছু লেগে থাকবেই। কী সেটা? প্রশ্নের সেই একই বাঁধা ধরা উত্তর। আলু কাটতে কাটতে কাপ ধরেছি, অথবা আটার হাতে, অথবা কাজের মহিলা ফাঁকি মেরেছে। তাদের তো কিছু বলার উপায় নেই আজকাল। আমাদের পক্ষাঘাত, তাদের উৎপাত। না পোষালে জবাব দিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাঘাত।

বাঁচার দুশ্চিন্তায় হতাশা, হতাশা থেকে মানসিক দুর্বলতা। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় স্নায়ু বিকল। প্রেসার, সুগার, গলব্লাডার, হার্টের ব্যামো। ঘুম স্বপ্নে ভরা। সারা রাত এপাশ-ওপাশ, ভোরের দিকে অজ্ঞান। সকালে দুর্বলতা। বিছানা ছাড়তে হয় জোর করে। তখন মনে হয় খাটের ধারেই অফিস, বাজার, দুধের ডিপোটা সরে আসে না কেন! হাত বাড়িয়ে পটল তুলব, পা বাড়িয়ে সেরেস্তায় ঢুকব।

সকলের মুখেই বিরক্তির ছাপ। কেউ কেন খলখল করে হাস না! হাসি যাত্রায় চলে গেছে। গৃহিণী তেলে বেগুন ছাড়তে ছাড়তে মনে মনে বলছে ধ্যাত্ তেরিকা। ছেলে পরীক্ষার পড়া করতে করতে বলছে, ধ্যাত্ তেরিকা। মেয়ে চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বলছে, ধ্যাত্ তেরিকা। কাজের মেয়েটি মাছ কাটতে কাটতে বলছে, ধ্যাত্ তেরিকা। পিত্তি গলে গেল। মাছ হয়ে গেল করলা। মাছের ঝোল যেন সুক্তো।

এমন কেন হল? সেই একই স্ট্রাটেজিক উত্তর, 'খাও না, তেতো খাওয়া তো ভাল। পিত্তি কমে যাবে। তোমার তো পিত্তের ধাত।' কি পাওয়া গেল থিওরেম! মাছের পিত্তি চটকে গেলে মানুষের পিত্ত ভাল হয়।

ডালে যে নুন দিতে একেবারেই ভুলে গেছ?

একই উত্তর। বেশি নুন খেলে প্রেসার বাড়ে। প্রেসার বাড়লে রাগ বাড়ে। রাগ বাড়লে ঝগড়া হয়। ঝগড়া হলে শত্রুবৃদ্ধি হয়। শত্রু বাড়লে বিপদের ভয় থাকে। বিপদ হলে চিন্তা বাড়ে। চিন্তা বাড়লে হজম কমে। হজম কমলে অম্বল হয়। অম্বল হলে চুল পাকে, গাল ভেঙে যায়, কাঠির মত শরীর হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়, স্ত্রীকে সহ্য করতে পারে না। অনবরত গালমন্দ অবশেষে কেরসিন দেশলাই কাঠি। তারপর হাতে দড়ি, প্রেসিডেনসি জেল। যাবজ্জীবন। অতএব বুঝেছ, নুনের কত গুণ।

কোনো জিনিস কেন খুঁজে পাওয়া যায় না, আলমারির চাবি, চেক বই, গেঞ্জি রুমাল ঠিকানা ফোন নম্বর?

এক উত্তর। আমি দশ মুণ্ডধারী মহিলা বারণ নই, তোমার ব্যাঙ্কের কম্পিউটার নই। আছে। সবই আছে একদিন না একদিন পাওয়া যাবে। বাড়ির জিনিস বাড়িতেই আছে যাবে কোথায়। ডানা নেই যে উড়ে যাবে।

তা হলে?

ধৈর্য ধরো। অত উৎকণ্ঠা কিসের! টেনসান মানেই সেরিব্র্যাল অ্যাটাক। প্যারালিসিস, বিছানা। পরনির্ভর। ধৈর্য সহ্য, এই সব বাড়াও, শুধু মেদ বাড়িয়ে লাভটা কী? যা পেলে তা পেলে, যা পেলে না, পেলে না। যখন কিছু পাবে না, স্রেফ মনে করবে তুমি মরে গেছ। মরে গেলে, শুধু চেক বই, জুতোর ফিতে, কাল ছেঁড়া গেঞ্জি নয়, গোটা পৃথিবীটাই থাকবে না।

বুদ্ধদেব রাজার ছেলে। স্বয়ং তিনিই বলছেন, Life is suffering. জীবন একটা অসুখ। কাতরাতে কাতরাতে ঘোঁত করে ঢেঁকুর তুলে স্থির হয়ে পড়ে থাকা। লোক থাকলে পোড়াবে, না থাকলে পড়েই থাকবে। পড়ে পড়ে পচবে। নিজের গন্ধে নিজেই নাকে রুমাল চাপা দেবে। তোমার আত্মা যদি আবার ঢুকতে চায় বাপ বলে পালাবে।

রাজার ছেলে গৌতম বুদ্ধ চারটি মহাসত্য আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন,

১ ॥ The existence of sorrow. দুঃখ সর্বত্র। তুমি আছ, তোমার দুঃখও আছে। তুমি নেই, তোমার দুঃখও নেই। কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল। যেই আবার আসবে ক্যাঁক করে ধরবে। জেল আর জেলার দুটোই রইল। তুমি মেয়াদ শেষ করে বেরলে, আবার এসে ঢুকলে।

২ ॥ The course of sorrow. একটাই কারণ দেহ। জন্মালেই দুঃখ,

না জন্মালে কোনো দুঃখ নেই। সমুদ্রে নামলে, ঢেউ, নোনা জল। না নামলে ফাসক্লাশ।

৩ ॥ The censation of sorrow দুঃখের নিবৃত্তি। বউ চিৎকার করে! মাকে লঙ্কাপোড়ার ধোঁয়া দেয়! রেগে গেলে লঘু-গুরু জ্ঞান থাকে না! বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। যাবে না, কিছুতেই যাবে না। তাহলে তুমি শ্বশুরবাড়ি চলে যাও। দুঃখের উৎসে যাও। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ভূতকে যদি চিনতে পার, তাহলে আর ভূতের ভয় থাকে না। চোর চোর খেলায় যে বুড়ি ছুঁয়েছে তাকে তো আর চোর করা যাবে না। সব অশান্তির উৎপত্তিস্থল মানুষের অহং। কামনা, বাসনা। সংসারে ঢুকেছ, সহ্য তোমাকে করতেই হবে। সংসারে শান্তি, সংসারে মতের মিল, সংসারে বন্ধু, ইত্যাদি অলৌকিক প্রাপ্তির আশা না করলেই দুঃখের নিবৃত্তি। বুদ্ধদেব বলছেন, ও হে মানব পুত্র! When a tree is burning with firee flames, how can the birds congregate therein? Truth cannot dwell where possion lives. দেহবৃক্ষটি কামনা বাসনার আগুনে জ্বলছে, তুমি কেমন করে আশা কর হে, যে সেই গাছের ডালে ডালে পাখি এসে বসবে, তোমাকে গান শোনাবে! সত্য আর কাম এক স্থানে থাকে কেমনে?

৪ ॥ The way which leads to the cassation of Sorrow : বুদ্ধদেব দুঃখ নিবৃত্তির অষ্টাঙ্গ মার্গ নির্দেশ করলেন, যেমন, যথার্থ বোধ, যথার্থ বিচার, যথার্থ উক্তি যথার্থ কার্য, যথার্থ জীবিকা, যথার্থ উদ্যম, যথার্থ চিন্তা, যথার্থ ধ্যান।

কথার তরোয়াল দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে কচুকাটা করা! স্ত্রী চায় স্বামী তার আদেশে কান ধরে ওঠবোস করবে। স্বামী চায় স্ত্রী তার কথায় ওঠবোস করবে। মা চাইবেন ছেলে আমার আঁচলের তলায় থাকবে। পিতা চাইবেন পুত্র চিরকাল তাঁর বশে থাকবে। মালিক ভাববে কর্মচারী মানুষ নয়। কর্মচারী ভাববে মালিক মানুষ নয়। নেতা ভাববেন জনসাধারণ ভোট মাত্র। জনসাধারণ ভাববে নেতা মাত্রেই চোর। চতুর্দিকে মড়মড় করে ভেঙে পড়ার শব্দ। এরই মাঝে টিভির পর্দায় নায়িকা নাচছে আর গাইছে, নাচ মেরা বুলবুল।

এটা পালটাবে না, পালটাতে হবে নিজেকে। There never was, there never will be nor is there now a person who is wholly blamed or wholly praised.

একেবারে ভাল, একেবারে খারাপ এমন মানুষ কোনো কালে ছিল না, কোনো কালো থাকবেও না। সু আর কু-র মিক্‌শ্চারই হল জগৎ। হিন্দি ছবির গান আ ইয়া ইয়া করু ম্যায় কেয়া, সুকু সুকু। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, জটিলে, কুটিলে থাকবেই, তা না হলে লীলা পোষ্টাই হয় না। বুদ্ধদেব বলছেন, সত্য হল এই, পৃথিবীতে আলোও থাকবে অন্ধকারও থাকবে। অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়া যায়, আলো থেকে আরো আলোতে। আবার অন্ধকার থেকে আরো গভীর অন্ধকারে।

স্বামীজি বলছেন, Face the brutes. ভেতরে অহরহ দানবের আস্ফালন। ভয় দেখাচ্ছে অন্তর্শায়ী ভয়। সেই ভয়ের দিকে রুখে দাঁড়াও। একালের বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার পেক বলছেন- let us teach ourselves and our children the necessity for suffering and the value thereof, the need to face problems directly and to experience the pain involved. পলায়ন নয় সম্মুখ সমর।

অতিক্রান্ত শতবর্ষে

"সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির- সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীয় নির্গুণ ব্রহ্ম হতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচো দেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি- নাই কি? আর বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে তো ঢের মাল আছে যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সে দিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হল, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে পঞ্চাশ মুণ্ডু একশত হাত, দুশ পেট, পাঁচ-শ ঠ্যাঙওয়ালা মুর্তি খাড়া! সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই- যিনি দ্বারদেশে; আর ওই যে বেদ, বেদান্ত দর্শন, পুরাণ শাস্ত্র সকল দেখছ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞেস করলুম- তবে এ দেবতার নাম কি? উত্তর এল- এঁর নাম লোকাচার। আমার লক্ষ্ণৌ-এর ঠাকুরসাহেবের কথা মনে পড়ে গেল : 'ভল্ বাবা "লোকাচার' অল্ মারো'।"

স্বামীজি পরিব্রাজক অবস্থায় সারা ভারতের সমাজ চিত্রের সাক্ষাৎ পরিচয় পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তোর মধ্যে দিয়ে আমি কাজ করব। আমার সিদ্ধাই করার জো নেই, তুই হবি আমার মিডিয়াম। আমাদের একমাত্র বিষয় হবে মানুষ। মানুষেরই ধর্ম। মানুষ বাদ দিয়ে ধর্ম হয় না, হতে পারে না। লোকাচারে সর্বস্ব, পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত ধর্ম শোষণেরই নামান্তর। দরিদ্র, অশিক্ষিত, অজ্ঞ মানুষকে বোকা বানানো, ভয় দেখানো। হাজার ভয়ে মানুষ সিঁটিয়ে আছে, ধর্ম হল ভয়ের ভয়, কিং কোবরা। বেদ-বেদান্ত যে-ধর্মের ব্যাখ্যা, সে হল :

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্র ব্যাখ্যানেকৌশলম্।
বৈদুষাং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

স্বয়ং শঙ্করাচার্যের এই সিদ্ধান্ত। নানাবিধ বাক্যবিন্যাস আর শব্দচ্ছটা যে প্রকার শাস্ত্র ব্যাখ্যার কেবল কৌশল মাত্র, সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ কেবল ভোগের নিমিত্ত, মুক্তির নিমিত্ত নহে।

সারা ভারত ঘুরে, সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, ধর্মসঙ্ঘের মাথাওয়ালা পুরুষদের চাঁচাছোলা প্রশ্ন করে স্বামীজি সার বুঝেছিলেন, তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্য, দ্বিতীয় নাস্তি। পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ গাজীপুর থেকে প্রমদাবাবুকে লিখছেন— এখন সিদ্ধান্ত এই যে— রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধ-জীবনের জন্য-এ জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার-যেমন তিনি নিজে বলিতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ 'লোকহিতায় মুক্তোছপি শরীরগ্রহণকারী' বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি সে মতিঃ।

সনাতন হিন্দু ধর্ম অতিশয় উদার। সাগরের মতো, আকাশের মতো। মত তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে মতুয়া করেছে, আর অনুগামীদের করেছে Fanatic. তখন মতই হয়েছে ধর্ম, দলই হয়েছে ধর্ম। ধর্ম হয়েছে আর এক ধরনের রাজনীতি। ধর্মের বিকার। স্বামীজির উদাহরণ : গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য-মহাপণ্ডিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার ; বন্ধুরা বলে তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অনুভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হলে ঐরকম চেহারাই হয়ে থাকে। যাই হোক, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতাগতি বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুন দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হতে মায় কাদা, পুনর্বিবাহ [দ্বিরাগমন]দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ-প্রয়োগ-সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা করে দিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝাবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকি সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে!!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন যা বলেন

তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠছে, সকল জিনিস বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে-সকল মুশকিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাকো। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বললে বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ!! 'বেঁচে থাক কৃষ্ণব্যাল' বলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যালদের আদর! 'ভল্ বাবা "আভ্যাস" অস্ মারো।' স্বামীজি ছুটছেন, দেখছেন, উত্তপ্ত হচ্ছেন। করতে হবে। ভারতের জন্যে ভাবতে হবে। স্বার্থ গোষ্ঠীর ওপর আঘাত হানতে হবে। ভেঙে গড়তে হবে। বলরাম বসুকে লিখছেন, 'আমার এক্ষণে শিখিবার সকলই আছে—আমার গুরু বলিতেন যে যতকাল বাঁচি ততকাল শিখি... সাতসমুদ্র তের নদী অথবা লঙ্কা ডিঙ্গাইয়া নাকে তেল দিয়ো ঘুমাইবার অধিকার আমার কোথায়?' না, ঘুমোবার উপায় রাখেননি তাঁর অসাধারণ গুরু। নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, তুমি আমার শ্বশুর ঘর। আমার মাদি ভাব, তোমার মদ্দা ভাব। তুমি শিব, আমি শক্তি। তুমি কর্ম আমি প্রেরণা। আমি পাওয়ার হাউস তুমি সার্কিট। তোমার নির্বাণের চাবি আমার কাছে। যেদিন বুঝব আমাদের সব কাজ শেষ হয়েছে। চাকা গড়িয়েছে এইবার চলার শক্তিতে চলবে, সেদিন দুয়ার খুলে উড়িয়ে দোবো পাখি শ্যামাপদ নীল আকাশে। এই তোমার পেয়ালা, চুমুকে চুমুকে পান কর। 'The cup'.

This is your cup– the cupassigned to you
from the beginning
Nay, My child, I know how much of that
dark drink is your own brew
of fault and passion, ageo long ago
In the deep years of yesterday, I know,
This is your road-a painful road and drear.
I made the stones that never give you rest.

আমাদের ষোল জনের বাছাই করা ওই যে দল, ওই দলের তুমি

নেতা। একখানে ওদের সঙ্ঘবদ্ধ করে একটা বিপ্লব তৈরি কর। ওরা আর নাই বা ফিরে গেল আঁষটে সংসারে, যেখানে একই অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি। দিন যায়, দিন যায়, শুধুই চলে যায়; যায় না রেখে কিছু। 'প্রমদাবাবু, মহাশয় হয়তো এই মায়ার প্রপঞ্চ দেখিয়া হাসিবেন- কথাও তাই বটে। তাবে কি না লোহার শিকল ও সোনার শিকল- সেনার শিকলের অনেক উপকার আছে, তাহা হইয়া গেলে আপনা আপনি খসিয়া যাইবে। আমার গুরুদেবের পুত্রগণ আমার অতি সেবার পাত্র— এই স্থানেই একটু duty-বোধ আছে।'

সোনার শিকলে বাঁধা নরেন্দ্রনাথ। চরকির মতো সারা ভারতে ঘুরছেন। 'আমার motto এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব।' প্রমদাবাবুকে লিখছেন স্বামীজি, "আমি রামকৃষ্ণের গোলাম- তাঁহাকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু করিয়াছি। তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না।

২। আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ...স্বর্গ বা নরক মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।

৩। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।

৪। অতএব উক্ত নির্দেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসীমণ্ডলী বরাহনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন, এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্বাহ এবং বাটী ভাড়া দিতেন।

৫। ভগবান রামকৃষ্ণের শরীর নানা কারণে [অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান রাজার অদ্ভুত আইনের জ্বালায়] অগ্নিসমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধহয় মুক্ত হইব।

৬। যাঁহার জন্মে আমাদিগের বাঙালীকুল পবিত্র ও বঙ্গভূমি পবিত্র হইয়াছে-যিনি এই পাশ্চাত্য বাকছটায় মোহত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন-যিনি সেই জন্যই অধিকাংশ ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী University men হইতে, সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন...

৭। পূর্বোক্ত দুই মহাত্মার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু তজন্য ১০০০ টাকা দিয়াছিলেন।...

৮। যদি বলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এসকল বাসনা কেন? 'আমি বলি, আমি রামকৃষ্ণের দাস-তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম-ও সাধন-ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অনুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজী।

স্বামীজি প্রমদাবাবুকে জানাচ্ছেন—বঙ্গভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। 'ত্যাগ' কাহাকে বলে এদেশের লোকে স্বপ্নেও ভাবে না। কেবল বিলাস, ইন্দ্রিয়পরতা ও স্বার্থপরতা এদেশের অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করিতেছে।

যাও নরেন্দ্র হোমাগ্নির মতো জ্বলতে জ্বলতে যাও কর্ম অর্থ, ভোগের পীঠস্থানে। বুঝে এস ভারত কোন অতলে। নেংলি গেঙি বাচ্চা কাচ্চা। পোকা জন্মায়, পোকা মরে। সাত বেহারার পালকি, কিংখাবে মোড়া রাজার মেদবপু। মন্দিরে মন্দিরে তিলকচর্চিত, চিতাবাঘ সদৃশ ধর্ম বিধায়ক ঘণ্টা বাজাচ্ছেন, মলিন বেশি, মলিন কেশ শত ভিখারি, শক্তি, বীর্য, আত্মজ্ঞান নয় বসে আছে লাবড়ার জন্যে। কলকাতার সভা ফাটছে জ্ঞানীর ভাষণে। টাকার ফোয়ারায় মদের গেলাস, শরীর বিকোতে এসেছেন দেহজীবী।

ফাটাও তোমার বোমা : 'গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২ টাকা ১৮৯৩]। ফলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? ক-জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণকাঁদে? হে ভগবান্ আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ির চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তামরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্যে কি করেছ, বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁও না। দূর দূর কর। আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁর এই অধিঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরিবদের জন্যে কি করছেন? খালি বলছেন, ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ— আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।

'আমি এদেশে [আমেরিকায়] এসেছি দেশ দেখতে নয়, তামাসা

দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্যে উপায় দেখতে সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে, যদি ভগবান সহায় ঘন।'

বরানগরের জীর্ণবাটীর সেই হোমকুণ্ড আজ বিশ্ব হোমকুণ্ডে পরিণত। পঞ্চশিখায় লকলক করছে পাঁচটি প্রজ্ঞা, শক্তি, বীর্য, কর্ম ধর্ম, মুক্তি। সহস্র সন্ন্যাসীর নিষ্কাম আহুতিতে জ্বলে আছে বিবেক চৈতন্য। এ মিশন নয় মহান মানবদ্বয়ের ক্রন্দন, 'ক্ষীর-ননী খেয়ে তুলোর উপর শুয়ে এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদো। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয় তখন- সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাংগতিম।'

তাহলে অতিক্রান্ত শতবর্ষে কি দেখছি! রামকৃষ্ণ ছায়ায় বিবেকানন্দ

The wounded snake its hood unfurls
The flame stirred up doth blaze.

হায় বাবা মানুষ!

আচ্ছা জ্ঞানী কে? যিনি প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখতে পারেন।

কে শক্তিমান? যিনি নিজের কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন।

কে ধনী? সেই মানুষই ধনী যে নিজের ভাগ্যে সন্তুষ্ট।

কে মানী? যিনি সমস্ত মানুষকে সম্মান জানাতে পারেন।

কোনো মানুষকে হতচ্ছেদ্দা কোরো না। কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। সব মানুষেরই সময় আসে, সব কিছুরই একটা জায়গা আছে। স্থান আর কাল আর অপেক্ষা। বেশি ট্যাঁ ফোঁ, হুড়ুম দুড়ুম না করে, নিজের ভাবে বিনীত হয়ে থাকাই তো ভাল, সব জারিজুরির তো একটাই শেষ কথা, ফুস হয়ে ফেঁসে যাওয়া। কে কাকে মানে, কে কার কথা মনে রাখে। মহাকালের রথের চাকা সকলকেই তো থেঁতলে দিয়ে যাবে। এই তো মানুষের নিয়তি। রাজা, মহারাজা, পাইক, বরকন্দাজ, সব ছাতু। টিংচার অফ স্টিল দিয়ে বন্দুকের নল পরিষ্কার করতেন আমাদের পাড়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভুবনবাবু। ছাত্রজীবনে দেখেছি। বড়লাটের সঙ্গে খানা খেতেন। তাঁর বউ গাউন পরে অর্গান বাজাতেন। বাড়ির বাগানে তিনটে অ্যালসেসিয়ান টহল দিত। বাজার আসত ঝুড়ি ঝুড়ি। এক ঝুড়ি ডিম, এক ঝুড়ি আনারস। শেষে সেই মানুষটার কী হল। প্যারোলিসিস। কোনো রকমে পা টেনে টেনে হাঁটতেন। বাড়ির বারান্দায় নড়বড়ে বৃদ্ধ সাজহান। ঔরঙ্গজিব মার্কা তিনটে ছেলে ভটভটি চেপে পাড়া কাঁপাত। রাতের বেলায় প্রপার্টি নিয়ে উদোম ঝগড়া। মারপিট। করুণ মুখে বৃদ্ধ দেখতেন, সাজানো বাগান শুকোচ্ছে। শেষে একদিন দড়াম। বড় ভাই শেষ বন্দুকের শেষ গুলিটা মেজকে হাঁকড়েছিল। মিস করে ফাদারের বুকে। পোস্ট মর্টেম। তিন দিন পরে সেলাই করা লাশ চপ্‌ল চিতায়। বড় গেল জেলে। বড়র বড়লোক বউ চলে গেল বাপের বাড়ি। আর

ফিরল না। দেখা গেল পর্দায়। সিনেমা অভিনেত্রী। কেরিয়ার তেমন জমল না ; কিন্তু ক্যারেকটার গেল চটকে। শেষে প্রস্টিটিউট। প্রপার্টি গেল জবর দখলে। মেজ গেল মদে। ছোট বেপাত্তা। গাউন পরা বউ ছেঁড়া কাপড় পরে লুকিয়ে চুরিয়ে ভিক্ষে করত। বাড়িতে যে মেয়েটি ঝিয়ের কাজ করত শেষকালে তার আশ্রয়ে। সেই মেয়েটিই দুহাতে সেবা করে পৌঁছে দিলে শ্মশানে। বুড়ি ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল আকাশে। অহঙ্কারী সুন্দরী একমুঠো ছাই।

এই পৃথিবীতে তিনটি মুকুট আছে, জ্ঞানের মুকুট, যাজকের মুকুট আর সম্রাটের মুকুট। সেরা মুকুট হল, সুনামের মুকুট। মানুষটা সৎ, বিনয়ী, মিশুক, দরদী এতখানি একটা হৃদয়ের মালিক। হীরে, জহরত বসানো এমন একটি মুকুট হল সবার সেরা। শেয়ালের মাথা না হয়ে সিংহের লেজ হওয়াও ঢের ভাল। দুষ্টের বৈভব না সতের দারিদ্র্য, কোনটা আদরনীয়, অধিক কাম্য মানুষের জানা নেই। হয় এদিক না হয় ওদিক, নিয়তির ঠেলায় মানুষ চলে যায়। এই জগৎ হল আগত জগতের দেউড়ি। সেই আগত জগতের ভোজসভায় প্রবেশের জন্যে এই দেউড়িতে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হও। এই জগতে একঘণ্টা অনুশোচনা, ঘণ্টাখানেকের সৎকর্ম ওই জগতের সারাটা জীবনের চেয়েও কাঙ্ক্ষিত, আর ওই জগতের একঘণ্টা স্বর্গীয় সুখ, এই জগতের সারাটা জীবনের চেয়ে অনেক অনেক ভাল।

যে শিক্ষা মানুষ শৈশবে গ্রহণ করে সেটি হল আচোট সাদা কাগজের লেখা। আর বুড়ো বয়েসে নতুন করে যদি কেউ শিখতে চায়, সেটা হবে কালি ধেবড়ান কাগজে লেখার মতো। শেখাটা পাকা লোকের কাছ থেকেই হওয়া ভাল। যিনি দেখেছেন, শুনেছেন, বৃদ্ধ হয়ে বসে আছেন বিদায়ের প্রস্তুতি নিয়ে। কাঁচা লোকের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া হল, কাঁচা আঙুর খাওয়া, কিম্বা সদ্য পেষাই মদ খাওয়া। প্রবীণের কাছে শেখা হল, পাকা আঙুর, প্রাচীন মদ খাওয়ার মত।

জীবনের স্তর আছে। প্রাচীনকালে যা ছিল, পাঁচে বর্ণপরিচয়, দশে পাঠ্যপুস্তক, তেরোতে ন্যায়, নীতি, অনুশাসন। পনেরোতে বেদ বেদান্ত। আঠারোতে বিবাহ। কুড়িতে জীবিকা। তিরিশে সবল, সাম সংসারী। চল্লিশে বিচক্ষণ। পঞ্চাশে উপদেষ্টা। ষাটে বার্ধক্যের অনুভব। সত্তরে পক্বকেশ বৃদ্ধ। আশিতে শ্রান্তি, সমস্যা। নব্বইতে ভীমরতি। একশতে মৃত্যু। একালেও তাই, কেবল শিক্ষার হেরফের। বেদ বেদান্ত ন্যায়

নীতি লোপাট। এখন দুর্নীতি রাজনীতি চুরি চামারি ডাকাতি। রাজনীতির মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক দেয়াল লিখন মোর্চা, মিছিল, বন্‌ধ, অবরোধ, ভাঙচুর, গণধোলাই, গণহত্যা অবশেষে নেতা। সি গ্রেড, বি গ্রেড, এ গ্রেড!

জ্ঞানীর সেকেলে 'জীবন সুখদায়ী উপদেশ' ছিল এইরকম, বিশাল, বিখ্যাত হওয়ার বাসনা কোরো না। তোমার শিক্ষা তোমার বিদ্যার পরিমাপে যেটুকু সম্মান পেলে তাতেই সন্তুষ্ট হও। রাজাদের টেবিলে বসার চেষ্টা কোরো না। তোমার নিজের টেবিলই শ্রেষ্ঠ, তোমার নিজের আসনই শ্রেষ্ঠ সিংহাসন।

শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞানীর সাতটি লক্ষণ :

১। তাঁর চেয়ে যিনি জ্ঞানী, তাঁর উপস্থিতিতে তিনি মুখ খোলেন না।

২। সতীর্থরা যখন কথা বলেন, তখন তিনি তাঁদের থামিয়ে দিয়ে নিজে কিছু বলেন না।

৩। তিনি কখনো তেড়ে গিয়ে প্রতিবাদ করেন না।

৪। তাঁর সমস্ত প্রশ্নই প্রাসঙ্গিক, সমস্ত উত্তর ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত।

৫। তাঁর সমস্ত কাজের একটা ধারা থাকে, প্রথমেরটা প্রথমে শেষেরটা শেষে।

৬। তিনি যা জানেন না সঙ্গে সঙ্গে তা স্বীকার করেন।

৭। সত্যকে তিনি তৎক্ষণাৎ মেনে নেন।

৮। নিজের সম্পর্কে তাঁর কোনো অহঙ্কার থাকে না।

চার ধরনের মানুষের প্রসঙ্গ আছে শাস্ত্রে :

১। সাধারণ মানুষ— আমারটা আমার, তোমারটা তোমার।

২। বিদঘুটে মানুষ বলবে— আমারটা তোমার, তোমারটা আমার।

৩। যাঁরা সাধু প্রকৃতির তাঁদের কথা হল— আমারটা তোমার তোমারটা তো তোমারই।

৪। বদমাইশ প্রকৃতির ধরন হল— আমারটা আমারই তোমারটাও আমার।

চার ধরনের মেজাজের মানুষের উল্লেখ আছে :

১। সহজেই উত্তেজিত আবার পরক্ষণেই শান্ত। এই স্বভাবের মানুষের প্রথমোক্ত দোষটা শেষোক্ত গুণের কারণেই খারিজ করা যায়।

২। সহজে উত্তেজিত হয় না, কিন্তু কোনো কারণে ক্ষিপ্ত হলে

আর তাকে শান্ত করা যায় না। এখানে গুণটা ওই এক দোষে নষ্ট হয়ে গেল।

৩। সহজে উত্তেজিত হয় না, হলেও তৎক্ষণাৎ শান্ত। এইটি হল প্রকৃত ভাল মানুষের মেজাজ।

৪। সহজেই উত্তেজিত এবং সহজে শান্ত হবে না। দুষ্ট লোকের এই হল মেজাজ। চার রকমের শিক্ষার্থীর শ্রেণী বিন্যাস করা আছে :

১। সহজেই শেখে সহজে ভোলে। তাৎক্ষণিক। অর্থাৎ তার প্রকৃতিদত্ত গুণটা ওই এক দোষেই বরবাদ।

২। ধীরে শেখে, কিন্তু সহজে ভোলে না। এখানে সামান্য ত্রুটি পরবর্তী গুণে পুষিয়ে গেল।

৩। চট করে শেখে আর সহজে ভোলে না। এ হল ভাগ্যবান।

৪। অনেক কষ্টে যা শেখে পরক্ষণেই ভুলে মেরে দেয়। এ হল দুর্ভাগা।

চার ধরনের দাতা আছে :

১। দান করে কোনো প্রতিদানের আশা করে না।

২। দান চায়, কিন্তু নিজে কখনো দান করে না।

৩। দান করে প্রতিদানের আশায়।

৪। দেয়ও না নেয়ও না।

জগৎ বৈচিত্র্যে ভরা। শস্যের একটা দানা আর একটা দানার মতো নয়। রকম রকম। বাইবেল ব্যাখ্যা করছেন, ভগবান সৃষ্টির আদিতে একজন মাত্র মানুষ তৈরি করলেন আদমের ছাঁচে। সেইটাই স্রষ্টার বিশেষত্ব। ছাঁচ একটাই কিন্তু যত মানুষ তত রকম। টাঁকশালে মানুষ ছাঁচে ফেলে টাকা তৈরি করে। সব একটাকাই একটাকার মতো। সেই কারণে প্রতিটি মানুষ অহংকার করে বলতে পারে— আমার জন্যেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। সেই কারণেই একজন মানুষ যদি আর একজন মানুষকে খুন করে তাহলে সমস্ত মানুষকেই খুন করা হল ; কারণ আদি মানব সেই একজন। একমেবাদ্বিতীয়ম। একজন মানুষকে রক্ষা করা মানে সমস্ত জগৎকে রক্ষা করা।

এক সাধুর কাছে একজন এসে বললে, গ্রামের মুখিয়ার আদেশ, অমুককে খুন করতে হবে। যদি আদেশ পালন না করি, তাহলে আমাকেই খুন করা হবে। সাধু বললেন, বেশ তো তুমিই না হয় খুন হলে। তুমি কী মনে কর তোমার রক্ত যে মানুষটিকে খুন করতে

চাইছ, তার রক্তের চেয়ে লাল ! এমনও তো হতে পারে, তার রক্তই বেশি লাল।

ঈশ্বর কেন একজন মানুষই সৃষ্টি করলেন, কারণ কোনো মানুষই যেন বলতে না পারে আমার পিতা তোমার পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এক পিতা এক সন্তান। সেই এক নশো কোটি হলেও, দরবারে সেই একপিতা, এক সন্তান। সন্তানের কোনো দ্বিতীয় পিতা নেই। এরই নাম— ডুয়ালিটি— তুমি আর আমি।

ঈশ্বরের কেন এক সন্তান, কারণ তিনি মানুষের মধ্যে কোনও জাত্যভিমান রাখতে চান না।

আমার জাতই শ্রেষ্ঠ একথা যেন কেউ বলতে না পারে।

কত কথা, কত ব্যাখা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ! জ্ঞান চর্চার যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা আছি ধান্দার যুগে। গদিতে উঠছে, গদি থেকে পড়ছে। ভারত জোড়া দর্শক তালি মারছে— আ, গির গিয়া, গিরগিয়া। তবে শেষ কথা হল : Nothing that goes into a man from outside can pollute him. It is what comes out of a man that pollutes him, immorality, stealing, murder, adultery, greed, malice, deceit, indecency, envy, abusiveness, arrogance, folly..সব কুছ- বাড়তেই রহেগা। হায় বাবা মানুষ !

ভাল আচি ভাই!

কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা সহজ কথাটা সহজ করে কিছুতেই বলবেন না। অ্যায়সা প্যাঁচ মেরে দেবেন, মনে হবে, ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। যদি প্রশ্ন করি- কেমন আছেন? অতি সাধারণ, সুভদ্র একটি প্রশ্ন। ভাল আছি, তুমি কেমন আছে, বললেই লেঠা চুকে যায়। প্রশ্ন আর উত্তরের এই দেঁতো স্বাভাবিকতাই আমাদের ধারা। সে পথে না গিয়ে, পালটা প্রশ্ন, কেমন দেখছ? এ বাজারে কেমন থাকা যায়? নিজে কেমন আছো দেখে বুঝতে পারছ না, আমি কেমন আছি, সে কেমন আছে, তাহারা কেমন আছে? রাম কেমন আছে, শ্যাম কেমন আছে!

-তবু, শুনেছিলুম, দাঁত নিয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন!

-দাঁত থাকলেই দাঁতের যন্ত্রণা থাকবে, হাঁটু থাকলেই বাত থাকবে, চোখ থাকলেই ছানি থাকবে, যৌবন থাকলেই জরা থাকবে। যদি বলি, খারাপ আছি, তাহলে তুমি আমার কোন ভালটা করতে পারবে? দাঁত তুলতে পারবে? তুমি কি ডেন্টিস্ট? আমার পাইলস অপারেশান করে দিতে পারবে? তুমি কি সার্জেন! আমার ছেলের কুচবিহারে ট্র্যানসফার আটকাতে পারবে? তুমি কি মন্ত্রী! কাল রাতে ঘটি বাটি, বাসন, সব চুরি হয়ে গেছে। উদ্ধার করে দিতে পারবে? তুমি কি থানার ওসি?

-আজ্ঞে! আমার খুব ভুল হয়ে গেছে!

-না, ভুল হয়নি। ভুল কেন বলছ? ভুল বলাটাই ভুল। বলো আদিখ্যেতা হয়েছে!

-সবাই জিজ্ঞেস করে, তাই করে ফেলেছি।

-না, করবে না, কখনো করবে না। কে কেমন আছে, তোমার জেনে লাভটা কী! আর যে ব্যাপারে লাভও নেই, লোকসানও নেই, সে ব্যাপারে তুমি সাধ করে নাক গলাতে যাবে কেন? থাকা, না থাকাটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার! আমি কেমন আছি, তোমাকে আমি নাও জানাতে পারি। আমি আমার মতো থাকতে চাই, আমার শত সমস্যা নিয়ে। দাঁতের কথা ডেন্টিস্টকে বলব, আইনের কথা উকিলকে বলব, বাড়ি মেরামতের কথা রাজমিস্ত্রীকে বলব, রান্নার কথা বউকে বলব, শাসনের কথা শাসককে বলব। জ্ঞানের কথা জ্ঞানীকে বলব,

প্রাণের কথা ভগবানকে বলব।

-আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করলে, আমি কী করব?

-তুমি অকারণে কথা বলতে চাইবে কেন? এই বদ অভ্যাসটা ছাড়। তোমার পকেটে টাকা আছে?

-আছে।

-কত আছে?

-শ তিনেক হবে।

-ওর থেকে না চাইতেই আমাকে একশো টাকা দেবে?

-না।

-কিন্তু তুমি অকারণে হাজারটা কথা আমাকে দিয়ে দেবে, কারণ কথার কোনো দাম নেই। মনে করো কথাও টাকা। তাহলে দেখবে অকারণে কথা বলতে ইচ্ছে করবে না। বাজে কথা যত কম বলবে, কথার ওজন তত বাড়বে।

-এইবার আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি। এত কথার কী আছে মশাই! এক কথাতেই তো সেরে দেওয়া যেত— ভাল আছি!

-তার মানে, তুমি জীবনটা কে মিথ্যের ওপর দাঁড় করাতে চাইছ! আমি ভাল নেই, তবু আমাকে বলতে হবে ভাল আছি।

-ভাল নেই তো, গটগট করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কী করে!

-ভালর সংজ্ঞা তোমার জানা আছে! ভাল থাকা কাকে বলে তুমি জান! চলে বেড়ানোটা হল মেকানিক্যাল ব্যাপার। দুটো ঠ্যাং আছে, একটার পর একটা ফেললেই চলা হল। মানুষের ভাল থাকাটা কোন জায়গায় আছে! কোথায় থাকলে সে ভাল থাকে! জান তুমি!

-আজ্ঞে না, তবে এইটুকু বুঝলুম, আপনি একটি শুকনো জিলিপি।

-আমিও বুঝলুম, তুমি একটি নির্বোধ গজা। ভাল শব্দটার ভেতরে কী আছে তোমার জানা নেই। ওটা তোমার কাছে অর্থহীন একটা শব্দ মাত্র।

-আপনার ঘোরতর ব্যাখ্যায় ভালটা কী!

-ভাল হল মন্দের বিপরীত।

-আর মন্দটা কী?

-ভালর বিপরীত।

-ব্যস, হয়ে গেল? এটা কোনো ব্যাখ্যা হল! এটা হল বদমাইশি।

-তাহলে তো তোমার সঙ্গে আমাকে তর্কযুদ্ধে নামতে হচ্ছে হে! তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলে, ভাল আছেন? তখন তুমি আমার কোন অংশের ভালটা জানতে চাইলে?

-আপনি একজন হেঁটে-চলে বেড়ানো মানুষ, সেই মানুষটা ভাল আছে কি না, এই ছিল আমার ক্ষুদ্র প্রশ্ন। সেই তিল যে এত বড় তাল হবে বুঝিনি আমি।

-মানুষটা ভাল আছে কি না! মানুষ কাকে বলে।

-আপনার লাইনে গেলে উত্তরটা হবে, যে গরু, নয়, যে ছাগল নয়, কারণ কোনো গরু পাশ দিয়ে চলে গেলে আমরা প্রশ্ন করি না, কী মশাই কেমন আছেন!

-কেন করো না?

-কারণ, গরু নির্বোধ প্রাণী।

-কে বলেছে, গরু নির্বোধ! গরুর যথেষ্ট বোধ আছে। আসলে তার ভাষা তুমি বোঝ না। কোনো রাশিয়ানকে তুমি আদিখ্যেতা করে জিজ্ঞেস করবে, কেমন আছেন! পরিচিত হলেও করবে না, যদি না তুমি তার ভাষা জান। তোমার কাছে তখন মানুষ আর গরু দুইই সমান। তাহলে মানুষ আর পশুতে তফাত কোথায়?

-মানুষ জামাকাপড় পরে দুপায়ে হাঁটে।

-সে তো উটপাখিও পালকের স্কার্ট পরে দু পায়ে হাঁটে। মানুষকে একটু ভাল করে বিশ্লেষণ করো।

-কাকাবাবু। আমি যে বাজারে যাব।

-না ভাইপো, অত সহজে তুমি নিস্তার পাবে না। তোমাকে আজ আমি কিঞ্চিৎ রগড়াব। তোমার সামনে এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমি কে? প্রথমে আমি একটা কঙ্কাল, শেষেও আমি একটা কঙ্কাল। যেমন, মা দুর্গা! প্রথমে একটা কাঠামো। জলে পড়ার পর, সেই একই কাঠামো। একটা কঙ্কাল তোমার সামনে হেঁটে হেঁটে এলে তুমি ভয়ে ভিরমি যাবে। তাই ঈশ্বর সাজ পরিয়ে দিলেন, তাঁর নিজের ওয়ার্কশপে। এক পরত মেদ, তার ওপর বিভিন্ন বর্ণের চামড়া, সাদা, লাল, বাদামী, কালো। এটা হল খাম। তোমাকে যদি বলা হয়, একটা খাম এসেছে, তুমি কী আশা করবে?

—ভেতরে একটা চিঠি আছে।

-যদি চিঠির বদলে ভাঁজ করা একটা সাদা কাগজ থাকে।

-ভাবব, কোনো ব্যাটা এপ্রিলফুল করেছে।

-তাহলে চিঠি কাকে বলে! এক গাদা অক্ষর। সে অক্ষর বর্ণমালা হলে চলবে না। সাজানো, অর্থবহ শব্দ হওয়া চাই, বাক্য হওয়া চাই। তাহলে বাচ্য আর বাক্যের সম্পর্কটা কী!

-আজ্ঞে ব্যাকরণ?

-ধুর বোকা ছেলে! ব্যাকরণ হল নিয়ম। ব্যাকরণ হল শৃঙ্খল। বাচ্য আর বাক্যের বন্ধন হল ভাব। এইবার তুমি মানুষে এস।

-আজ্ঞে এই পর্যন্ত আজ থাক না। এরপরে বাজারে গেলে আর মাছ পাব না।

-আরে মাছ না পাও মাছি তো পাবে। যেটা ধরছি, সেটা তোমার ওই মাছ ধরার চেয়েও কঠিন কাজ। এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া চাই। ভাল থাকাটা কী! কে ভাল থাকে! খাম ভাল থাকে না চিঠি ভাল থাকে। হাড় মাংসের খাঁচা, তার মধ্যে যন্ত্রপাতি! একটা লাল জলের নদী, একটা হাইডেল পাওয়ার স্টেশান, তার নাম হার্ট। অজস্র শাখানদী, তার নাম ভেনস, আর্টারি, মাথা একটা কম্পিউটার, চোখ দুটো ক্যামেরা, পেছনে একটা ফটো ল্যাবরেটারি, কান দুটো স্টিরিও, কিডনি-দুটো ফিল্টার, স্টম্যাক হল মিক্সি, লিভার হল ল্যাবরেটারি, কোলন হল ড্রেনেজ সিস্টেম। এই চলমান কারখানা হল প্রোডাকসান মেশিনারি, এটা ভাল থাকলেই কি ভাল থাকা হল! ভাল থাকার বোধটা কোথায় আছে?

-কোথায় আছে?

-আরে প্রশ্নটা তো আমি তোমাকে করছি! তুমি সেটা আমাকে ঘুরিয়ে মারছ কেন?

-সব গুলিয়ে গেছে।

-সেই বোধটা আছে মনে। মন কোথায় আছে?

-মন আছে মনে।

-বয়স্ক মানুষের সঙ্গে চ্যাংড়ামি কোনো না। মন আছে ভাবে। এইটাকে বলতে পারো মানুষের আবহাওয়া। মন হল আকাশ। কখনো মেঘলা, কখনো রোদ ঝলমলে। কখনো বসন্ত, কখনো বর্ষা। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। খামটা খোলো, চিঠি নেই। তাহলে তুমি পড়বেটা কী? আমি ভাবে আছি, না অভাবে আছি তোমাকে বোঝাব কী করে? নিজেই তো জানি না। তুমি কি ভাল আছ? তোমার পেট ভাল আছে, চোখ, নাক, কান লিভার, কিডনি, ভাল আছে-ডাক্তার বলেছেন; কিন্তু তোমার তুমিটা কি ভাল আছে? আমার আমিটা কি ভাল আছে?

-এবার কি ছুটি?

-শুনে যাও—কক্ষনো কারোকে জিজ্ঞেস করবে না, কেমন আছেন? প্রশ্ন করা মানেই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া। বলবে ভাল আছি। মানুষ কখনো ভাল থাকতে পারে না, কারণ তার বোধ আছে। এক মাত্র মিথ্যাবাদীই বলতে পারে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে—ভাল আচি ভাই!

সকালে উঠিয়া আমি

সকালে ঠেলেঠুলে নিজেকে তুললুম। এক কাপ না আসাম, না দার্জিলিং, মধ্যবিত্ত-বাঙালি-চা পান। মুখ টক টক। প্রতিজ্ঞা, কাল থেকে ইন্টেলেকচ্যুয়াল কালো চা। প্ল্যাস্টিকের বিবর্ণ ব্যাগ হাতে বাজারে। খানিক গুঁতোগুঁতি। দুর্গন্ধ। সেই ঢ্যাঙা ঢেঁড়স, গোদা পটল, থ্যাসথ্যাসে অন্ত্র-মাছ। সজনে ডাঁটা দামের চাবুক। এঁচড় আধুনিকার অসহ্য। মোচা মঙ্গলকাব্যের মতোই প্রাচীন। পোস্ত গাছে হয় না, তৈরি হয় ঢালাই কারখানায়।

ঘর্মাক্ত প্রত্যাবর্তন। আবার এক কাপ চা। কাগজ। হেডলাইনে দ্রুত ভ্রমণ। সেই এক সিদ্ধান্ত, দেশ সামনের দিকে সামান্যও এগোয়নি, পেছন দিকে অসামান্য অগ্রগতি। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত, দেশ কার? যাদের দেশ তারা লড়ছে। গতি, অগ্রগতির জন্যে নয়, গদির জন্যে। তুমি কে?

॥ প্রার্থনা ॥

সকালে উঠিয়া আমি
মনে মনে বলি
ওরা যেন সুখে থাকে
দিয়ে নরবলি ॥
চমচমে চিকেনে যেন
ফুলে ওঠে ভুঁড়ি
হাঁটা চলা ভুলে গিয়ে
ভুঁয়ে গড়া গড়ি ॥
অবোধে অবোধ রাখো
সুবাধে সুবোধ
মিছে কেন ভেবে মরো
বেটা নির্বোধ। ওঁ শান্তি ॥

এক লাফ। আয়না। গালে সাবান। হাঁই মারো মারো টান হাঁইও। বাজেট কড়া। দাড়িও কড়া। ব্লেড সাত টাকা। এক মাস চালাতেই

হবে। গালের মেয়েলি দুটো পাশ সড়াক করে নামবে, প্রবলেম চিবুক। ওয়ান, টু, থ্রি, বলো বীর, চড় চড়িয়ে টান। মসৃণ হবে না অবশ্যই। ওই থাক। সঙ্কল্প : যদি পয়সা হয়ে প্রোমোটারদের মতো, নিত্য কামাবো দাড়ি নতুন ব্লেডে। অন্তরীক্ষে নিয়তির কণ্ঠস্বর : সে সুযোগ এ জীবনে পাবে না মানিক। ঘড়ি দর্শন। জীবনদর্শন অফ। হড়কে বাথরুমে প্রবেশ। সাবান সমস্যা। সাবান বেড়াতে যায়। একতলায়, দোতলায় টানাটানি। থাকলে ভাল, না থাকলে মোরারজি দেশাই। জলের মতো কসমেটিক নেই, হাতের মতো সাবানই নেই, 'না খাওয়ার' মতো খাওয়া নেই। নিজেকে একশো বছর সাকার রাখতে লিভারকে বেকার রাখো।

এইবার একটু ধর্ম। এক চোখ ইষ্টের দিকে আর এক চোখ ঘড়ির দিকে। জপ দৌড়চ্ছে। জপের অলিম্পিক। বীজমন্ত্র, প্রণবমন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র জড়াজড়ি। ল্যাং মারামারি। যাঃ, চাটার্ড বাস বুঝি যায় বেরিয়ে। জপ ডিউ থাক। আগে চাকরি পরে ভগবান দর্শন। অত সহজে তিনি দর্শন দেবেন না। তিন কোটি জপে একটু শীত শীত। ছ কোটিতে গায়ে কাঁটা। তিরিশ কোটিতে ঝিলিক। ফুট নোট, ভেরিফাই করে নাও, রেটিন্যাল ডিট্যাচমেন্টেও ঝিলিক। সোজা ভেলোর। ঝালাই। কালো চশমা। দিব্য দর্শনেও যা লক্ষণ, অন্ধত্বেও সেই একই লক্ষণ। তিরাশিলক্ষ যোনি পার হয়ে এলে তবেই আহ্বান মাত্রই দিব্যদর্শন। স্কুল, কলেজে যেতে হবে না। জীবিকার জন্যে জুতো খেতে হবে না। জন্মানো মাত্রই জ্যোতি। দিব্য গন্ধ, দিব্য শ্রবণ। প্রেমের ফোয়ারা। সেবা, ভাত, বেগুনপোড়া নয়। মালপো, ছানা, আম, আঙুর, পেস্তা, বাদাম থাক ডিউ। তিন লক্ষ হয়েছে পাওনা, হোক না আরো কয়েক লাখ। সময়মতো শোধ হবে। তিনি তো আর কাবুলিআলা নন। এত কাণ্ডেও যে স্মরণে রেখেছি। এই তো তাঁর ভাগ্য ! কিছুই তো তিনি দিলেন না। অফিসের মালিক আর ওই ভগবান দুইই সমান। দজনেরই লেনেআলা, দেনেআলা কেউ নয়। শত তেল মেরেও প্রোমোশান হবে না। নিজের গাড়ির মডেল বদলাবে বছর বছর তোমার জীবনের মডেল সেই কয়েক হাজার টাকা নির্ভর। ভগবানের নিত্য নতুন মন্দিরে কত রোশনাই। মার্বেল আর স্ফটিকের জেল্লা, আর সামনে সমবেত ভক্তকুল ! যেমন তাদের বসনভূষণ, তেমন তাদের চেহারা। সব অম্বল আর বাতের রুগি। বেশির ভাগ প্রৌঢ়াই এক প্রার্থনা জানান- মা, মা কবে নেবে মা ! বাকিটা নীরবে, বুড়োর ভিটকেমি, ছেলের শয়তানি আর সহ্য হয় না মা। বউটা যেন জলবিছুটি !

প্রৌঢ়দের চোখ মুখের দিকে তাকালে মনে হয় ভূত দেখেছে। চশমার মোটা কাচের আড়ালে ঠিকরে আসা চোখ। সব মনের কথা

মনেই আছে। প্রকাশ নেই। মুখ নয় তো, দই পাতা হাঁড়ি। ষাটটা বছর ছোটাছুটি। প্রেম, পুলক। আশা, আকাঙ্ক্ষা। কত ছোলার ডাল, মুচমুচে ধোঁকা! আসল ধোঁকা ষাটের পর।

॥ ছড়া ॥

দুধ শুকলো, চাকরি গেল, মাস মাইনে খতম
আদর যত্ন, মান সম্মান, সোহাগ টোহাগ যত
কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেউ দেয় না মলম ॥

এক লাফে বাসে। চালাও ভাই জলদি চালাও। চারপাশে একই পুরনো কথা! সৌরভটাকে সহ্য করতে পারছে না, মুম্বাইয়ের মামারা। দাদা! গুজরালের আয়ু কদ্দিন! লেলোটা কী আরম্ভ করেছে!

ফিস্ ফিস প্রশ্ন - আপনার কী সব কোল্যাপসিব্‌ল!

-শরীরটা! একটা জায়গাই কোল্যাপস করে, সেটা কোমর।

-না, না, সব দরজায় কোল্যাপসিব্‌ল গেট লাগিয়েছেন?

-পয়সা কোথায়?

-অ্যায়! সেম প্রবলেম! কিন্তু লাগাতে তো হবেই। কালই পাশের বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেল।

-আমাদের কী আছে মশাই যে নেবে!

-আরে সেটাও তো সমস্যা, ভীষণ রাগারাগি বকাবকি করে। দত্তদাকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল । ছঘণ্টা পরে পুলিস এসে কান থেকে হাত খোলালে। সঙ্গে সঙ্গে কোল্যাপস। এই অপমান অসহ্য। সে স্কুল ডেজে রোজই কান ধরে বেন্‌চে স্ট্যান্ডআপ করেছি, গায়ে লাগনি। ওটা রোজা। এই বয়েসে হোয়াট ইজ দিস!

-থাক, বলে ভাল করলেন। এইবার যেখানে যা আছে সব এনে ডাকাতদের জন্যে তোলা সাজিয়ে রাখবেন, আমিও রাখব। তাহলে আর কান ধরতে হবে না। বুক চিতিয়ে বলব, সাধ্যমতো করেছি বাবা, সন্তুষ্ট তো! ডাকাতি আর পক্স এক জিনিস, একবার হলে আর হয় না।

-ডাকাতির ভ্যাকসিন আছে?

-আছে! ডিক্লেয়ার করে দিন। ডিক্লেয়ার করে দিলে ট্যাক্সোঅলারা 'রেড' করে না। ডাকাতরা তো কালেক্‌টার! কোল্যাপসিবল গেট মানেই আছে কিছু, বরং একটা সাইনবোর্ড ঝোলান :

বেশি আশা কোরো না, মজুরি পোশাবে না
পুরনো জামাকাপড়, গোটা দুই আলনা ॥

ছাই

বার্তা রুটি গেল ক্রমে মৈত্র মহাশয় যাবেন সাগরসঙ্গমে। অনেকটা সেই রকম। ভীষণ অসুস্থ সে। গেল গেল অবস্থা। মাঝেমাঝেই কুম্ভক হয়ে যাচ্ছে। স্বেদ, কম্প। নবদ্বারে লক আউট। ডাক্তার বদ্যি ফেঁড়ে ফেলছে। উকিলমশাই রেডি হয়ে আছেন লাস্ট টেস্টামেন্ট লিখে ফেলার জন্যে।

দিগবিদিক থেকে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনরা আসছেন যাচ্ছেন। মাঝে মধ্যে জুতোর গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক চুরি নয়, এ ওরটা পরে চলে যাচ্ছে, ও এরটা। ইনভেরিয়েবলি নতুনগুলোই যাচ্ছে, পুরনোগুলো পড়ে থাকছে। ফলে, একটু অসন্তোষ, মানুষের চরিত্র তুলে কথা।

সবই কানে আসছে। কেউ এসেছেন বাদু থেকে, কেউ এসেছেন বারাসত থেকে, কেউ এসেছেন বেড়াচাঁপা থেকে। আসার কী কষ্ট। সেই সব কথা হচ্ছে। সংসার ছেড়ে বেরনো যায় সহজে! বড়টার পরীক্ষা, ছোটটার হাম, নিজের আবার আক্কেল দাঁত, সাত দিন হয়ে গেল কাজের লোক আসছে না, তার ওপর গ্যাস গেছে। কত কাণ্ড করে দেখতে আসা।

—কই দেখি, আহা, বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। ক'দিনে কী চেহারা হয়েছে! একটু ভাল করে খাও দেখি চিকেন, টিকেন।

—খেতেই পারছে না!

—পারছে না বললে তো হবে না, খেতে হবে। তোমরা কী করতে আছ? যে ভাবে মার খায়, সেই ভাবে খাওয়াবে। সোজা করে বসাবে, জোর করে হাঁ করাবে, আর ঠেলে ঢুকিয়ে দেবে।

—বের করে দেয়।

—আবার ঢুকিয়ে দেবে। খেতে হবে, না খেলে কী করে হবে! চড়া চড়া সব ওষুধ।

প্রতিবাদীপক্ষ থাকবেই। তাঁদের একজন বললেন, ইচ্ছে না থাকলে

জোর করে খাওয়ানো উচিত নয়। উলট ফল হবে! এখন বরং ফলপাকড়ের ওপর রাখাই ভাল। শরীর যখন নিচ্ছে না, তখন জোর করে চিকেন খাওয়ালে টকসিন হয়ে তিন দিনেই টেঁসে যাবে।

—আরে ফলে কী আছে, ফলের স্ট্রেংথ কতটুকু! এইটটি পার্সেন্ট জল, টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভিটামিন সি, সুক্রোজ, ফ্রুকটোজ, গ্লুকোজ। তখন থেকে ফলফল করছ। ফলের সুফল 'নিল'। খালি পেটে ফল খাওয়া মানে সিরোসিস অফ লিভার।

—বাজে বোকো না, সেকালে মুনিঋষিরা কী খেতেন?

—এ মুনিও নয়, ঋষিও নয়, সেকালে পোস্টমর্টেম ছিল না, থাকলে দেখা যেত নাইনটি পার্সেন্ট সিরোসিস অথবা বি হেপাটাইটিস।

—তোমার মাথা, এক একজন মুনি তিনশো-চারশো বছর বাঁচতেন। সব ইচ্ছা মৃত্যু। ইচ্ছে হল, ধপাস করে পড়লেন, মরে গেলেন।

—যাক, অত তর্কে কাজ নেই, এখন এ কী খাবে, সেইটাই হল কথা।

—খিদে না পেলে কিচ্ছু খাবে না।

—কঙ্কাল হয়ে যাবে যে।

—যাক, মানুষ মরে, কঙ্কাল মরে না। ও যদি ঠিক ঠিক কঙ্কাল হতে পারে, এ যাত্রা বেঁচে গেল।

টালিগঞ্জ থেকে একজন এলেন, ঘরে ঢুকেই বললেন, যাঃ, সর্বনাশ হয়ে গেল!

আর একজন আশ্বাস দিলেন, না, না, এখনো হয়নি, জাস্ট ইন টাইম। প্রাণ এখনো লেগে আছে।

—ধুর মশাই, এখানে আসতে গিয়ে পিকপকেট হয়ে গেল। ব্যাগে হাজার এক টাকা ছিল। ভেবেছিলুম একটু আঙুর কিনে আনব, সে আর হল না। যথাসর্বস্ব গেল।

—টাকাটা ছিল কোথায়?

—টাকা কোথায় থাকে? অ্যাজ ইউজুয়াল ইন এ ব্যাগ।

—অ্যান্ড, হোয়্যার ওয়াজ দি ব্যাগ!

—ইন দি হিপ পকেট!

—ব্যস্, একটা কথা বলবেন না, নট এ সিঙ্গল ওয়ার্ড। মাছের জন্যে টোপ ফেলবেন, খেয়ে গেলে বুক চাপড়াবেন, ওসব নকশা আমরা অনেক দেখেছি।

কোণের দিকে দর্শনার্থী দুই স্বজনে হুলোর যুদ্ধ চলেছে। চোখ বুজিয়ে মরণাপন্ন রুগি শুনছে। হাতাহাতি হল বলে। পঞ্চানন ঘোষালের পকেটমার বইটা পড়ে দেখতে অনুরোধ হয়।

—হু ইজ পঞ্চানন!

—যার এই নলেজ তার পকেটমার হবে না ত, আমার হবে!

—আপনি কোন নলেজ দেখাচ্ছেন মশাই আমাকে! কোনও নলেজেই পকেটমারের নলেজকে ঠেকানো যাবে না, আন্ডারস্ট্যান্ড!

—অ্যায়, এই কথাটিই বলতে চাই। এই নলেজের আন্ডারে স্ট্যান্ড করুন। টাকা যেখানেই রাখুন মারবেই মারবে।

—রাইট! কিন্তু উপায়! পথ চলতে কড়ি। খালি পকেটে তো আর রাস্তায় বেরনো যাবে না!

—কেন যাবে না! এর তার কাছে ধার করে চালিয়ে দেবেন। যারা ধার নেয়, তাদের কাছেই পাওনাদার আসে। ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বসে থাকবেন, তারা এসে পাওনা বুঝে নিয়ে যাবে। শুনুন মশাই, এই কালটা হল কোকিলের কাল। কাকের বাসায় ডিমটি পেড়ে দিয়ে কেটে পড়ুন। এই যে বিরাট বিরাট ইন্ডাস্ট্রি, সব পরের পয়সায়। নিজের ইনভেস্টমেন্ট নিল। একটা গান মনে আছে! দম্ মারো দম্। সেইটাকেই একটু মডিফাই করলে একালের ন্যাশনাল সং—দাঁও মারো দাঁও।

হঠাৎ মনে পড়েছে, কই হে তোমাদের চা কোথায় গেল! কেউ পেল কেউ পেল না। দ্যাটস ভেরি ব্যাড। একালের মেয়েরা সব ক্যালাস। আমাদের কালে কী সব চোখ ছিল! ছাতে উঠে দেখলে, সেই মোড়ের মাথায় জ্যাঠামশাই আসছে, তর তর করে নেমে গিয়ে কেটলিতে এক কাপ জল ঢেলে দিয়ে এল।

—অসুখবিসুখের বাড়িতে অত খেয়াল থাকে কি? আপনি চা খেতে এসেছেন না রুগি দেখতে?

—দুটোই। চা খেয়ে, দু-পাঁচ কথা কয়ে, অ্যাটেন্ডেনস নোট করিয়ে চলে যাওয়া। আমাদের ফর্মালিটি দেখতে আসা, তোমাদের ফর্মালিটি চা। চা তো আর রুগি করবে না, করবে তার বউ।

ইতিমধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ একজন অসুস্থ মানুষটির কপালের দখলদারি পেয়ে গেছেন। কেউ অসুস্থ হলেই কপাল টেপা ইজ এ মাস্ট। কপাল ছোঁয়া মানে চূড়ান্ত দেখা। একেবারে ইনার সার্কলে চলে আসা।

—খুব টিপটিপ করছে ত! করবেই। আমার কিছু হলেই ফার্স্ট অ্যাটাক কপালে। গেল গেল অবস্থা। চোখ বুজোও। জাস্ট রিল্যাক্স। কপাল এখন আমার হাতে।

ভদ্রলোক বাজান সেতার। আঙুলে গুটলে গুটলে কড়া। সেই আঙুল চোখের তলা দিয়ে পাক মেরে, ভুরু ছেঁচে যখন দু'পাশের রগে গিয়ে কাপ মেরে বসছে, তখন মনে হচ্ছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। কপালের নুন ছাল উঠে যাওয়ার দাখিল। বলা যাবে না। তবু একবার বলা— খুব আরাম পেয়েছি, আর থাক, অনেকক্ষণ টিপলেন, আপনার কষ্ট হবে।

—আমার কষ্ট! সকালে তিন, রাতে পাঁচ, মোট আট ঘণ্টা রেওয়াজ করি। এখনও, এই বয়েসে! দিস ইজ এ শরীর মেড অফ স্টিল। ইচ্ছে করলে এ আমি ঘণ্টা তিনেক চালাতে পারি অক্লেশে।

মানুষ ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তার চেয়ে বড় সমর্পণ অন্যের হাতে নিজের কপাল।

জনৈক মহিলা তাঁর মেয়েকে বলছেন, চুপ করে বসে না থেকে কাকুর আঙুলগুলো একটু মটমট করে দে-না, তুই তো খুব ভাল পারিস, এই তো সেবার আমার জ্বরের সময় করে দিচ্ছিলিস! আঃ, সে কী আরাম।

মরেছে, কপালে বুলডোজার, আঙুলে বাংলা পুলিসের থার্ড ডিগ্রি। অনেকের আঙুল সহজেই মট, দুর্ভাগ্য, এর আঙুল জীবনে মট করেনি। প্রশংসিতা মেয়েটি মহোৎসাহে এক একটি আঙুল ধরছে আর আপ্রাণ চেষ্টা করছে, মটকে শব্দ বের করার।

এদিকে একজন পায়ের দিকে চলে গেছে। ময়দা ঠাসার কায়দার গপাগপ খাবলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পায়ের ডিম দুটো ধনুকের ছিলে টানার কায়দায় টেনেই ছেড়ে দিচ্ছে, তখন সুপুরি টাইট হয়ে বাবারে, মারে অবস্থা!

নড়াচড়া করলেই সমবেত সেবাকারী আর দর্শকরা একযোগে বলে উঠছেন, 'ওইখানটা, ওইখানটা!' সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে সেই জায়গাটা। পুরো ব্যাপরাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে—সবে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

এতক্ষণ যাঁরা কুলু-মানালি ভ্রমণের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের মনে হল, কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত— এর প্রবলেমটা কোথায়?

—ধরা যাচ্ছে না—এক মতে, নন ফাংশানিং কিডনি, গলব্লাডার, হার্নিয়াও হতে পারে, আর এক মতে ভাইরাল জন্ডিস অথবা সিরোসিস।

—সাংঘাতিক ব্যাপার। কলকাতার ট্র্যাফিক জ্যামের চেয়েও মারাত্মক। বাড়িতে ফেলে রেখেছে কেন?

—রাখেনি ত! কে রাখতে চায়! বাধ্য হয়ে পড়ে আছে। মেয়ের পাত্র খোঁজার মতো নার্সিংহোম খোঁজা হচ্ছে। কে কত পণ চায়! বাজেটের মধ্যে এলেই ট্র্যান্সফার!

দেখুন, গরুদের কী মজা। সব গরুই এক গরু, এক ভেটিনারি হাসপাতাল। মানুষের কত রকম!

—কোথাও কিছু জোটেনি!

—ওই যে বললুম, চেষ্টা চলেছে।

—আমাদের দিকে একটা আছে, হাফ চার্জ। হাফ হওয়ার একটাই কারণ, খাটগুলো সব পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে আটকে গেছে। হাতল মারলেও ফ্ল্যাট হচ্ছে না। মানিয়ে শুলেই হল! কখনও পা ওপরে মাথা নীচে, কখনও মাথা ওপরে পা নীচে। মৃত্যুকালে পা দুটো ওপরে রাখলেই হল—কথাতেই তো আছে—ঠ্যাং উলটে মারা গেল, কিক দি বাকেট। বলো তো খোঁজপাত করে দেখি!

—আমরা কমসমে একটা পেয়েছি, সেটার বাথরুম নেই। ভাবছি, বাথরুমের তো প্রয়োজনই হবে না। একদিকে নল চলবে, ওদিকে ইউরিন্যাল আর বেডপ্যান!

—তাহলে দুটোরই রেট নেওয়া যাক। যেটা লোয়েস্ট হয়!

—আরে ভাই বিরাট সমস্যা তো অন্যখানে।

—সে টাকাটাও নেই! লোয়েস্টের লো হয়ে আছে?

—বলতে পারো একেবারে কপর্দকশূন্য, অবস্থা।

—যখন খুব লপচপানি ছিল, তখন কত সাবধান করেছি, ওরে অত উড়াস না, অত উড়িস না। ইংরিজি, বাংলা, সংস্কৃত তিনটে ল্যাঙ্গোয়েজেই উপদেশ দিয়েছি। তুমি জান, আমার পিতামহ শিক্ষক ছিলেন। সেকালের বসুমতীতে তাঁর জীবনী ছাপা হয়েছিল। সেই ব্লাড আমার শরীরে।

—আপনার বাবা তো চাল-ডালের ব্যবসা করতেন। মজুতদারি আইনে জেল খেটেছিলেন প্রফুল্ল সেনের আমলে।

—অ্যায়! একেই বলে বাঙালি! কী ঘটে আর কী রটে! বাবা

জেলে গিয়েছিলেন বাম রাজনীতি করতেন বলে! অমনি রটে গেল মজুতদার! কিছু বলার নেই ভাই। চরিত্রহননে বাঙালি-তুলনাহীন!

—আপনাদের পরিবারকে সেই কারণেই কি সবাই বামচারী বলে!

—বামাচারী শব্দটা কি খুব ভাল?

—ভাল নয় কেন? সাধনের কথা। তন্ত্রের কথা।

—শোনো ছোকরা, এই সব কথা তোমরা ঈর্ষায় বলো। এক বাঙালি একটু রাইজ করলেই আর এক বাঙালির বক্ষদেশ ফেটে যায়।

—যাক, ওসব কথা থাক, আপনি কী উপদেশ করেছিলেন শোনা যাক, নিজের জীবনে যদি গ্রহণ করতে পারি!

—অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করছিলুম, ছোকরার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। যে গঙ্গার ইলিশে আমরাই হাত দিতে সাহস পাই না, সেই ইলিশ ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরছে। জিজ্ঞেস করলুম, বাঁ হাতের কামাই আছে? বললে, না। আমি বললুম, তাহলে এই আত্মঘাতী কাজটি কেন। শাস্ত্র কী বলছেন জানো! বললে, শাস্ত্রফাস্ত্র মানি না কাকাবাবু। এ জিনিস চোখে দেখে ছাড়া যায় না।

আমি বললুম, শোনো, ইদমেব সুপাণ্ডিত্যং চাতুর্যমিদমেব চ! ইদমেব সুবুদ্ধিত্ব মায়া দল্‌পতরো ব্যয়ঃ॥

—খুবই কঠিন উপদেশ, মানেটাই বোঝা গেল না।

—যদি কোনও ব্যক্তি তার যা আয় তার থেকে কম ব্যয় করার কৌশল দেখাতে পারে, তবে তা হবে তার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয়, সেটাই হবে তার চতুরতার লক্ষণ এবং সেটাই হবে তার উত্তম বুদ্ধির পরিচয়। কারণ আয়ের চেয়ে-কম ব্যয় করার কৌশল সকলের জানা নেই। সোজা কথা, কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ।

—এটা কিন্তু দেবভাষার উপদেশ নয়। বিলিতি। সঞ্চয়ের সাজেশান নেই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। সঞ্চয়ের উপদেশ হল, ফুল প্যান্টের রোজগার হলে হাফপ্যান্ট পরো। তাহলে কী হল, বাকি হাফ ব্যাঙ্কে গেল।

—ওটা আবার বাড়াবাড়ি। আসল কথা হল, ওয়েস্ট নট ওয়ান্ট নট। মনে আছে তো সেই কবিতা, যে জন দিবসে মনের হরষে।

—মনে নেই আবার! পুরুষানুক্রমে শুনতে শুনতে রক্তে চলে গেছে। আমার বাবা আমার মাকে বলতেন, আপনার বাবা আপনার মাকে বলতেন। তারপর, ইলেকট্রিক এসে গেল। দিবস কেন, রজনীর প্রথম প্রহর আলোকিত করতেই মাসে হাজার।

—'কী আলোচনা হচ্ছে হে তোমাদের! একটু পরেই এক স্পেস্যালিস্ট আসছেন শুনলুম। আসছেনই যখন, যত কাজ থাক রেজাল্টটা শুনে যাই। এই অভ্যাসটা আমার ক্রিকেট থেকে হয়েছে। ইন্ডিয়া হারবেই, তবু থেবড়ে বসে আছি টিভির সামনে, সব কাজকর্ম ছেড়ে। রেজাল্টটা কী হয়! ওর অবস্থা যা দেখলুম, ভাল মনে হচ্ছে না। ওরা বলছে বটে!

—কিসের স্পেস্যালিস্ট আসছেন?

—বললে, পেটের স্পেসালিস্ট। দুশো টাকা ভিজিট। আরও দামী আছে, পাঁচশো এক টাকা। তিনি তিন মাসের আগে ডেট দিতে পারছেন না। এরা বলেছিল, তার আগেই যদি রুগি টেঁসে যায়। ভীষণ মেজাজি ত! শুনলুম, উত্তরে বলেছেন, ওখানে বিধান রায় আছেন, তিনিই দেখে দেবেন। এঁর সম্বন্ধে আরও সব গল্প আছে, একবার এক জুনিয়ার ডাক্তার অনেক বলা কওয়া করে রাজি করালেন, স্যার, পরিবারের একমাত্র আর্নিং মেম্বার, হাতেপায়ে ধরছে, কৃপা করুন। ডাক্তার বললেন, কোন চুলায় যেতে হবে? আজে কাছেই, ভেরি নিয়ার। মধুসূদন মিত্তির লেনে ঢুকেই সাতখানা বাড়ির পরে, এইটথ্ হাউস। জুনিয়ারকে নিয়ে ঢুকলেন গলিতে। এক, দুই, তিন...। দেখা গেল জুনিয়ারের হিসেবে ভুল হয়েছে। ডাক্তার বাড়ি গুনছিলেন, অষ্টম বাড়ির সামনে এসে বললেন, আবার ওদিকে কোথায় এগচ্ছো! এই বাড়িটা ত! জুনিয়ার বললে, স্যার! একটু ভুল হয়ে গেছে, ওই মোড়ের বাড়িটা। ডাক্তার অ্যাবাউট টার্ন। গেলেন না। বললেন, ইচ্ছাকৃত। আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা। এখন তো রোগের চেয়ে ডাক্তারকেই বেশি ভয়। অনেকে হাসতে হাসতে শ্মশানে যাবে, তবু বাঘা বাঘা স্পেস্যালিস্টের কাছে যাবে না। ঠক ঠক করে কাঁপছে। ডাক্তার বলছেন, এ আবার কী! জ্বর নেই কাঁপছে! এ কী কোল্ড কফির মতো কোল্ড ম্যালেরিয়া? আজকাল নার্সিংহোমে রুগির আত্মীয়স্বজনকে বলে, 'পার্টি'। সেই পার্টিদের একজন ডাক্তারবাবুকে বোঝাচ্ছে, আপনার ভয়ে কাঁপছে স্যার। আমি একবার আমার বউয়ের জন্য এক এম এল এ-র সুপারিশ নিয়ে, সাহসে বুক বেঁধে এক বিরাট ডাক্তারের চেম্বারে গেলুম। বললে, তিনি এখন সায়েবি আমলের এক ক্লাবে আছেন। প্রাণের দায়ে গেলুম সেখখানে। অনেক কসরতের পর দেখা। প্রথম কথাই হল, আমার ফি জানেন তো? পাঁচশো। দিতে পারবেন! বললুম, স্যার! চুন,

বালি, সিমেন্টের কারবারি, প্রোমোটারিতে নেমেছি, বাপ, পিতামোর আশীর্বাদে পাঁচশো কেন পাঁচ হাজারও দিতে পারি। রোজ এক বোতল স্কচ দিয়ে গুড নাইট করি। তিন একটু নরম হয়ে বললেন, আপনার গাড়িটা পাঠাবেন। জিজ্ঞেস করলুম, বিলিতি চাপবেন, না দিশি!

—তোমার ব্যবসা, গাড়ি, স্কচ, কী সব বলছ হে!

—কিস্যু নেই।

—তাহলে? কী করলে?

—কিছুই করলুম না। বই পড়ে ঠুকে দিলুম বাইয়ো কেমিক।

—বেঁচে গেল?

—বাঁচবে না! ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার গরু মরে। তিনি বহাল তবিয়তে রাবড়ি দেবী হয়ে পশুপালন পদ্ধতিতে স্বামী পালন করছেন।

স্পেস্যালিস্ট এসে গেছেন। সবাই তটস্থ। এইবার একটা এসপার ওসপার হবেই হবে। তিনি বসলেন। ভারি, থমথমে মুখ। সারাদিন যাঁকে যমের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাঁর মুখ ব্ল্যাক ক্যাটের মতো ওই রকম হওয়াই স্বাভাবিক।

রুগির পাশে একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'কই দেখি?'

ঘরের সবাই একবাক্যে বললেন, 'দাও, দাও, হাতটা এগিয়ে দাও, নাড়ি দেখবেন।'

ডাক্তার বললেন, 'নাড়ি কে দেখবে। ওসব প্রিমিটিভ পদ্ধতি। কবিরাজি ব্যাপার। বায়ু, পিত্ত, কফ। এখন আর আমাদের রুগিকে ছুঁতে হয় না। যন্ত্রেই সব ধরা পড়ে যায়। একেবারে ডেফিনিট ডায়াগনসিস। রিপোর্টগুলো দিন। কী কী টেস্ট হয়েছে।'

ঢাউস একটা ফাইল, বড় বড় খাম, সব বেরিয়ে পড়ল। তিন চার রকমের ব্লাড টেস্ট রিপোর্ট, এক্স-রে প্লেট, স্ক্যানিং-এর তিন চার রকম। ছড়াছড়ি ব্যাপার। ডাক্তারবাবুর ঠোঁটের কোণে এই প্রথম একটু হাসি ফুটল।

সেই হাসি দেখে এক শুভানুধ্যায়ী সাহস করে প্রশ্ন করলেন, 'তেমন সিরিয়াস কিছু নয়, তাই না ডাক্তারবাবু?'

আবার গম্ভীর থমথমে মুখ, কী করে বলব? এই সব টেস্ট কোথা থেকে করিয়েছিলেন? রাবিশ! আবার গোড়া থেকে সব করান, আমি বলে দিচ্ছি কোথা থেকে করাবেন। দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান প্লেস। এগুলো সব ফেলে দিন।

—ডাক্তারবাবু এসব করাতে অনেক টাকা গচ্চা গেছে। প্রবলেমটা কী হয়েছে আপনাকে খুলে বলি, টাকা যে নেই তা নয়, আছে, তবে বেশির ভাগই আছে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে। কোনওটা দু হাজারে, কোনও দু হাজার পাঁচে ম্যাচিওর করবে। এখন ইন্টারেস্টে সংসার চলছে কোনওক্রমে। আগেকার ডাক্তারবাবুদের মতো করুন না।

—সেটা কী?

—এই একটু টেপাটিপি, একটু স্টেথিসকোপ, পেটের ওপর আঙুল রেখে আর একটা হাতের তর্জনি দিয়ে পাঁই পট বাজান, হাঁ করিয়ে গলায় টর্চলাইল ফেলা, সামনে মা কালীর মতো জিভ ঝোলাতে বলা। সেকালের ডাক্তারখানায় ডাক্তারবাবুর পেছনের দেয়ালে জিভ বের করা মা কালীর ছবি থাকত। ওই দেখে রুগির অটোমেটিক জিভ বেরিয়ে আসত। রসিক ডাক্তারবাবু বলতেন, পরমায়ু থাকলে জিভ ঢুকবে নয়ত ঝুলেই থাকবে। আমাদের পাড়ার সত্য ডাক্তারের চেম্বারে লেখা ছিল, মনে কর শেষের সেদিন কী ভয়ঙ্কর, অন্যে সবে কথা কবে তুমি রবে নিরুত্তর।

ডাক্তারবাবু রেগে গিয়ে বললেন, তাহলে আপনারা একজন অ্যান্টিক ডাক্তার ডেকে আনুন, শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করান কেন!

দত্তপুকুরের দাসবাবু মধ্যস্থতা করলেন, বাজে কথায় কান দেবেন না ডাক্তারবাবু, বাঙালির সবাই উপদেষ্টা। জ্ঞান দিয়ে দিয়ে জাতটা অজ্ঞান হয়ে গেল। আপনি আপনার সিক্‌সথ সেনস দিয়ে একবার বলুন তো ব্যামোটা কী?

ডাক্তারবাবু হেলা ভরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার প্রবলেমটা কী? কী হয়?

—আজ্ঞে অনেক কিছু।

—অনেক কিছু থেকে বাছাই করে পেটের দিকটা বুলন। কারণ আমি পেট।

—আজ্ঞে, অতীত বলব, না বর্তমান?

—অতীত থেকে বর্তমানে আসুন।

—শৈশব থেকে শুরু করব?

—আজ্ঞে না, পাঁচ-দশ বছর অতীত।

—একবার আলসার হয়েছিল।

—কী করে বুঝলেন? এন্ডোস্কোপি হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দুবার। পেপটিক, ডিওডেনাম। যিনি করেছিলেন, তাঁর আনন্দ হয়েছিল। এক আকাশ তারার মতো এক পেট জ্বলন্ত রক্তমুখী আলসার।

—তারপর ? চিকিৎসা করিয়েছিলেন ?

—করাইনি আবার। নানা রকমের ওষুধ। তার মধ্যে একটা ছিল চুনের মতো। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন পেটের দেয়ালে চুনকাম হচ্ছে। একটা মাথার ওষুধ ছিল। বলেছিলেন মুড়ি আর ভুঁড়ি কানেকটেড। মাথায় একটা স্পট আছে, দুশ্চিন্তা এলেই সেখান থেকে একটা মেসেজ পেটে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চুঁই চুঁই করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বেরোতে থাকে। একটা ওষুধ দিয়েছিলেন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাবেটার। আর একটা দিয়েছিলেন অ্যান্টি ডিপ্রেসান্ট। আলসার আর ডিপ্রেসান হল হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ।

—ঠাণ্ডা দুধ খেতে বলেছিলেন ?

—একদম না। তবু আমি খেয়েছিলুম। পেট জয়ঢাক। বন্ধ করে দিলুম। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, সব খাবেন, এমন কি মোগলাই পরটা, কষাও খেতে পারেন। তবে ওষুধ খেতে হবে।

—মোস্ট মডার্ন ডাক্তার! কোথায় থাকেন ?

—ক্যালিফোর্নিয়ায়।

—এখানে এলেন কী করে ?

—বেড়াতে।

—তা, আলসার থেকে গেলেন কোথায় ?

—হাঁপানিতে।

—বাঃ, বাঃ, ওপর দিকে উঠছেন। ঊর্ধ্বগতি। কী করলেন ?

—দুই স্পেস্যালিস্টে বুক নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল। একজন লাঙ্গসের এক্স-রে দেখে বললেন, এ তো দেখছি ধূপধুনো দিয়ে আরতি হচ্ছে, ঘণ্টাটাই কেবল বাজেনি। মাঝে মাঝে সানাই। অ্যান্টিবায়োটিক চার্জ করতে হব। আরও বড় বুক স্পেস্যালিস্ট বলেন, পাগল হয়েছেন, অ্যান্টিব্যায়োটিক মারলেই সব জড়িয়ে যাবে। এ সারার নয়, একে কন্ট্রোলে রাখতে হবে। সকালে ফ্যাঁস ফ্যাঁস, রাতে ফ্যাঁসফ্যাঁস। পকেটে ফ্যাঁসফ্যাঁস।

—তার মানে ইনহেলার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেক দাম। একজন বললেন, এ তো মশাই

ডিফেনসিভ খেলা, যে কোনও মুহূর্তে গোল খেয়ে যাবেন। চলুন, আপনাকে এক বড় কবিরাজমশাইয়ের কাছে নিয়ে যাই। হাঁপানির বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবেন। কলকাতার তাবৎ বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর কৃপায় আজও শ্বাস নিচ্ছেন, নেতারা মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আজও গগন ফাটাচ্ছেন।

—সেই ওষুধে ভাল হলেন?

—ওই খেলে একটু কমে, ছাড়লে আবার বেড়ে যায়, তখন আবার সেই ফ্যাঁসফোঁস।

—জানতুম। হবে না ওতে। অ্যালারজেন টেস্ট করান। ধরা পড়ে যাবে কী থেকে হচ্ছে।

—সেটা কী?

—একশো সাঁইত্রিশটা ইনজেকসান দেবে। ট্যাঁড়সের রস, বেগুনের রস, ডালের জুস, ছানার একস্ট্র্যাক্ট, বিছানার একস্ট্র্যাক্ট। প্রতিদিন যে সব জিনিসের সংস্পর্শে আসছেন সেই সব জিনিসের নির্যাস।

—একদিনে একশো সাঁইত্রিশটা ইনজেকসান?

—না, না, একদিনে কেন, বেশ কয়েকদিন ধরে। যাক, সে পরে হবে। এই মুহূর্তে সমস্যাটা কী?

—এবার তাহলে একটু নিচের দিকে নামি। উত্থানের পর পতন। প্লাম্বিং কেস।

—মানে?

—ঠিকমতো হচ্ছিল না।

—কী হচ্ছিল না? অত হেঁয়ালি করছেন কেন? আমার আরও সতেরটা কল আছে।

—ওই প্রস্টেট হলে যা হয়। কিছুতেই হতে চায় না।

—এ কী, তাহলে আমাকে ডেকেছেন কেন? ইউরোলজিস্টের কাছে যান।

—গিয়েছিলুম। যত রকমের টেস্ট আছে সব করিয়ে নিয়ে গেলুম।

—তা ফিরে এলেন কেন?

—কেস অন্য দিকে বেখাপ্পা ঘুরে গেল।

—এত ঘোরাঘুরি করলে চিকিৎসা করা যায়! যে-কোনও একটা অসুখ সিরিয়াসলি ধরে থাকুন। ঘন ঘন ট্র্যাক চেঞ্জ করলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে। একই রাস্তা ধরে অনেক গাড়ি ছুটছে, লেন ঠিক রাখুন।

এর বেশি আর কী অ্যাডভাইস আমি আপনাকে দিতে পারি?

—আজ্ঞে, আমার চেষ্টায় তো কোনও ত্রুটি ছিল না, অসুখটা নিজের থেকেই ঘুরে গেল। ছ ফুট লম্বা বলিষ্ঠ সেই বিশেষজ্ঞ হাতে একটা রাবার গ্লাভস পরে মিষ্টি করে বললেন, সামান্য একটু কষ্ট দোবো যে।

—বুঝেছি, পার রেকটাম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখে বললেন, কিস্যু হয়নি, একটা লিভার ফাংসান টেস্ট করিয়ে আনুন, একটা ওষুধেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তাহলে? কুঁই কুঁই করছেন কেন?

—সেইটাই তো বলতে চাইছি, সে যে অনেক কথা।

স্পেস্যালিস্ট ভুরু কুঁচকে জুনিয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও হে, এ যে রোগের মহাভারত! আমি যদি ট্যাক্সি হতুম ওয়েটিং চার্জ ভাড়ার চেয়ে বেশি হয়ে যেত। এ তো একটা রুগি নয়, দশটা রুগির সমান। রোগের দশানন, রাবণ।

জুনিয়ার বললেন, ওঁর এটাও একটা রোগ। কোন কালে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, সেই থেকে এই ডিটেলসের কাজ বেড়ে গেছে।

—সেই উপন্যাস তুমি পড়েছে?

—পড়েছি, কারণ আমিও একটু আধটু লিখি যে, বনফুলের ট্রাডিসান।

—ডিটেলসের কাজ কাকে বলে!

—অপারেশানের আগে অ্যানেসথেসিয়ার মতো। যেমন ধরুন, এঁর সেই উপন্যাসে নায়ক নায়িকাকে বলবে, রমা মাথাটা ভীষণ ধরেছে। চারটে শব্দ; কিন্তু পুরো দু'পাতা লেগে গেল।

—কী করে লাগল! ব্রাজিলিয়ান ফুটবল! এর পা, ওর পা করতে করতে...

—নায়ক শঙ্কর মাঝদুপুরে বাড়ি ঢুকছে। গরমকাল। জামার পিঠের দিকটা ভিজে গেছে ঘামে, কালো কালো দাগ। কেন ভিজেছে। ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শঙ্কর সকালেই বেহালায় গিয়েছিল। উল্টোডাঙ্গা থেকে কেন গিয়েছিল বেহালায়! শঙ্করের একমাত্র বোন বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি বেহালায়। শঙ্কর ন'মাসে ছ'মাসে যায়। হঠাৎ ওই দিনই যেতে হল কেন? বিন্দুর স্বামী এক মাস হয়ে গেল নিরুদ্দেশ। কেন নিরুদ্দেশ? লোকটা কি বদস্বভাবের? অবশ্যই নয়। আসামের চা-বাগানের ম্যানেজার। আসামের চা-বাগান, রাজনীতি, সন্ত্রাসবাদ, উলফা, অগপ, ভারত কোন পথে

চলেছে। গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যের এই দেশ। ছি ছি, অক্ষম রাজনীতিকরা দেশটাকে আজ কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে! যদুবংশ এই ভাবেই ধ্বংস হয়েছিল। শঙ্কর বাসে ফিরেছে। বসার জায়গা পেয়েছিল। ঠেসান দিয়ে বসেছিল। সাধারণত সে সিটের পেছন দিকে পিঠ ঠেকায় না। খাড়া হয়েই বসে, যাতে জামার পেছন দিকে বিশ্রী দাগ না লেগে যায়। এমন সচেতন মানুষ কেন এমন ধেসকে গেল! মনটা ভাল ছিল না। জীবনের কোনও দাম আছে বন্ধু! জামা সচেতন হয়ে লাভটা কী!

—তোমাকে ঠাস করে একটা চড় মারতে ইচ্ছে করছে।

—শিবরামবাবুর গল্পের নায়ক ঠিক এই কাজই করেছিল।

—কত ফ্যাঁকড়া বেরোবে আর?

—আমার দিক থেকে লাস্ট। ইংরেজ আমলের দোতলা বাস। দেশ জুড়ে ঘোর স্বদেশী আন্দোলন চলেছে। সেই সময় এক নিরীহ, ভেতো বাঙালি যাত্রী, এক মেমসাহেব সহযাত্রীকে সপাটে গালে এক চড় কষিয়ে বসল। পুলিশ থেকে আদালতে। জজ সায়েব আসামীকে জিজ্ঞেস করছেন, যা হয়েছে সব খেলাখুলি বলো। আসামী বললে, ধর্মাবতার খোলাখুলিই বলব। মেমসাহেব বসেছিলেন দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ঠিক পাশের সিটে। কন্ডাকটার টিকিট চাইলেন। মেমসাহেব তখন হাতব্যাগ খুলে মানিব্যাগটা বের করে হাতব্যাগটা বন্ধ করলেন। তারপর ভাড়ার পয়সা বের করে মানিব্যাগটা বন্ধ করে হাতব্যাগটা খুলে মানিব্যাগটা ভেতরে রেখে, হাতব্যাগটা বন্ধ করলেন। ইতিমধ্যে কন্ডাকটার ভেতর দিকে চলে গেছেন। তখন মেমসাহেব হাতব্যাগটা খুলে মানিব্যাগটা বের করে হাতব্যাগটা বন্ধ করলেন। এইবার মানিব্যাগে পয়সা রেখে মানিব্যাগ বন্ধ হাতব্যাগটা খুললেন। মানিব্যাগ রেখে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কন্ডাকটার মহিলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মেমসাহেব তখন হাতব্যাগ খুলে মানিব্যাগটা বের করে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন। তারপর মানিব্যাগ খুলে পয়সা বের করে মানিব্যাগ বন্ধ করলেন। কন্ডাকটার ততক্ষণে দোতলায় উঠতে শুরু করেছেন। মেমসাহেব মানিব্যাগ খুলে পয়সা রেখে মানিব্যাগ বন্ধ করে হাতব্যাগ খুলে মানিব্যাগটা রেখে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন। হঠাৎ কন্ডাকটার মাঝ সিঁড়ি থেকে নেমে এলেন। মেমসাহেব তখন হাতব্যাগ খুলে মানিব্যাগটা খুললেন..জজসাহেব উঠে এসে আসামীর গালে ঠাস করে এক চড়।

অভিযুক্ত বললেন, ধর্মাবতার। এর বেশি আমি কিছু করিনি। আপনি শুনে যা করলেন, আমি তা দেখে করেছি। তখন আসামী বেকসুর খালাস পেলেন।

স্পেস্যালিস্টের কৌতূহল জেগেছে। জিজ্ঞেস করলেন, শেষ পর্যন্ত ভাড়া কি দেওয়া হয়েছিল?

—সেটি আর শিবরামবাবু লেখেননি।

—নাও, এক কাপ চা বলো। আজ আমার সব গেল।

রুগির বাড়িতে বিরাট স্পেস্যালিস্ট চা খেতে চেয়েছেন। সাংঘাতিক ব্যাপার। এর অর্থ রুগি ব্রাত্য শ্রেণী থেকে জাতে উঠল। এবার ঠিক ঠিক আন্তরিক চিকিৎসা বেরোবে। 'আপ দি স্লিভস' অনেক কিছু থাকে, 'ট্রেড সিক্রেট', এইবার সেই সব বেরিয়ে আসবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এঁর নায়কের মাথা ধরার কেসটা কত দূর গড়াল?

—সাবেক আমলের বাড়ি। নায়ক ঢুকছে। সদর দরজা সারাদিন খোলাই থাকে। নিচের তলায় একঘর বিহারী বহুদিন ভাড়া আছে। বাইরে একটা বেওয়ারিশ রক। সেই রকে একটা কুকুর শুয়েছিল। ঘুম নয়, জাস্ট শুয়ে থাকা। কুকুরটা নায়ককে দেখে পটাপট লেজ নাড়তে লাগল। কেন? ব্যাখ্যার প্রয়োজন। একটা প্যারা। নায়ক শঙ্কর কুকুরটাকে রোজ সুযোগমতো বিস্কুট খাওয়ায়।

এইবার এল জীবনদর্শন। মানুষ আর কুকুরের তুলনামূলক সমীক্ষা। মানুষ শ্রেষ্ঠ, না কুকুর শ্রেষ্ঠ! হাজার হাজার বছর আগের কুকুর, আর এই কুকুর, আর হাজার বছর পরে যে কুকুর আসবে, স্বভাব চরিত্রে সব একইরকম থাকবে। কোনও কুকুর কখনও বলবে না, কুকুররা সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে! মানুষের সমাজের জেনারেসান গ্যাপ কুকুরদের মধ্যে আসবে না।

বেড়াল, পাখি, হাতি এমন কী শুয়োরের বাচ্চাদের মধ্যেও দেখা যাবে না। কিন্তু মানুষ হামেশাই শুয়োরের বাচ্চা, কী বাঁদরের বাচ্চা হয়ে যেতে পারে। মানুষের মানবিকতা চলে যাচ্ছে কুকুরের কাকবিকতা যাচ্ছে না। পাখির পাখবতা ঠিকই আছে।

—কাকবতা, পাখবতা, শব্দগুলো?

—অ্যায়! জিজ্ঞেস করেছিলুম আমিও। নতুন শব্দের সমন্বয়, নিউ কয়নেজ। মানব থেকে যেমন মানবতা।

—কুকুর থেকে কুকুরতা হলেই তো হত?

—না, এটা পশুর পথে গেছে। পশু থেকে পাশব থেকে পাশবিকতা সেই রকম..

—তাহলে কুকুর থেকে কাকব থেকে কাকবিকতা, থাক ব্যাকরণে দরকার নেই, ফুটনোট দিলেই হবে।

—উপন্যাসে ফুটনোট চলে না।

—প্রবন্ধোপন্যাসে চলে। আজকাল তো গল্প থাকে না, ফ্যাটলেস বাটার, ক্রিমলেস মিল্কের মতো গল্পলেস উপন্যাস। হ্যাঁ, তারপর, শঙ্করের কুকুরদর্শনের পর!

—শঙ্কর করুণ মুখে কুকুরটাকে বললে, সরি। এখন কিছু নেই রে! পরে দোবো। কুকুরের লেজ স্থির হয়ে গেল। একটা হাই তুলল। শঙ্কর তাদের সেই সাবেক কালের পুরনো বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠছে আর ভাবছে, পঞ্চাশ বছর আগে এই সিঁড়ি নিয়ে ওঠানামা করতেন এক বিখ্যাত, জাঁদরেল ব্যক্তি, রায়বাহাদুর গিরীন্দ্রশেখর। লাটসাহেবের সঙ্গে ভোজ খেতেন। চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট। কোটের ওয়াচ পকেটে সোনার ঘড়ি সোনার চেন বুকের কাছে ঝুলছে। সিংহের মতো দাপট। আবার নদের নিমাই পালা শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলতেন। কান্না নয়, প্রেমাশ্রু বিসর্জন করতেন। আর আজ! হাতির বংশধর ছুঁচো!

—খুব বোরিং লাগছে।

—উপায় নেই, আধুনিক উপন্যাসের বুনোট। স্বাদু নয় পুষ্টিকর। শঙ্কর ঘরে ঢুকে দেখলে স্ত্রী ঘুমোচ্ছে। যৌবনের শেষবেলার আলোয় এখনও ছমছমে। কাছে যেতে, কাছে পেতে ইচ্ছে করে। শঙ্করের মনে হল, একটু কাতুকুতু দিলে কেমন হয়!

—এই জায়গাটা ভালো লাগছে।

—একটু পরেই খারাপ লাগবে। কারণ শঙ্করের মাথা ধরেছে। প্রায়ই ধরে। ডাক্তারের সন্দেহ মাইগ্রেন।

—যাঃ, মাইগ্রেন হলেই হল! কোন ডাক্তার! ইরেসপনসিবল কথাবার্তা! মাইগ্রেন জেনেটিক ফ্যাক্টার। রায়বাহাদুরের মাইগ্রেন ছিল? রায়বাহাদুরানীর মাইগ্রেন ছিল?

—না।

—সব পেট থেকে হচ্ছে। হাইপার অ্যাসিডিটি। এন্ডোস্কোপি করে দেখতে হবে আলসার আছে কি না! মাথা ধরলেই মাইগ্রেন? বমি

করে, অ্যাটে স্ট্রেচ তিন চার দিন মাথা ধরা থাকে! মাইগ্রেন হলে স্ত্রীকে কাতুকুতু দেবার ইচ্ছে করত না, খামচা খামচা করে মাথার চুল ছেঁড়ার ইচ্ছে করত।

—জামা খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রেখে শঙ্কর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচেই রাস্তা। আইসক্রিমঅলা গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

শঙ্করের মনে হল ছেলেবেলায় একটা আইসক্রিমের জন্য কত লালায়িত হত! এখন সে একশোটা আইসক্রিম কিনতে পারে বলে একটাও কিনবে না। প্রাচুর্যের চেয়ে অভাবই ভাল।

—নো, দ্যাটস এ রং ফিলজফি। অভাব ভাল নয়। বাট সংযম ইজ গুড। বেহিসেবি হওয়াটা ইজ ব্যাড। মধ্যবিত্তের উপন্যাসে এই সব নেগেটিভ সার্মন থাকে। সেভিংস অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার। আমি রাখব, আমি খাব। তুমি তো জান আইসক্রিম অ্যান্টাসিড। তবে হ্যাঁ, হাই ফ্যাট, হাই ক্যালরি। কোলেস্ট্রাল না থাকলে একটা খাওয়া যায়; কিন্তু রাস্তার আইসক্রিম নয়, ফ্রম এ গুড শপ অফকোর্স। ক'টা বাজল?

—প্রায় একটা।

—তাহলে আর তো সময় নেই। আমাকে চেম্বারে যেতে হবে, সব লাইন দিয়ে হা পিত্যেশ করে বসে আছে।

—মাথাধরাটা শুনবেন না?

—ওটা মাইগ্রেন নয়, আই অ্যাম সেন্ট পার্সেন্ট সিওর।

এইবার রুগির দিকে তাকিয়ে স্পেস্যালিস্ট বললেন, একদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে চলে আসুন একটা এন্ডোস্কোপি করে ভেতরটা দেখেনি। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আলসার আছে। এ একেবারে বনেদি অম্বুলে চেহারা, সেকালের বিধবা পিসিমাদের মতো। হাজারখানেকে হয়ে যাবে।

—এই দেখুন, গুলিয়ে ফেলেছেন, ওটা উপন্যাসের অসুখ, আর আপনি এসেছেন লেখকের অসুখ দেখতে।

—কিস্যু গুলোইনি। লেখকের অসুখই তো উপন্যাসের অসুখ হয়। সৃষ্টির ব্যাধি মানেই স্রষ্টার ব্যাধি। ঈশ্বরের আচার খাওয়ার ইচ্ছে হয় বলেই না সৃষ্টিতে আচার এসেছে। সব ওইখান থেকে আসছে, কাটলেট, ক্যাবারে, মোগলাই, কষা, ডাক্তার, খুনী। মুরগিও যার মুর্গমসল্লমও তার।

—কিন্তু দেশলাই দর্শনটা না শুনলে কিছুই শোনা হল না।

—দেশলাই দর্শনটা কী?

—শঙ্কর বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে। মাথা ধরাটাকে যদি একটু বাগে আনা যায়।

—কী করে যাবে? টোব্যাকোয় আরও বাড়বে।

—ইতিমধ্যে সে এটা ভেবেছে। সতর্কবাণীটাও তার মনে ভেসে উঠেছে, সিগারেট স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ। পরক্ষণেই তার একটা সংস্কৃত শ্লোক স্মরণে এসেছে। পুরাকালে ইন্দ্র একদিন পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,আপনার সৃষ্টি পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু কোনটি? উত্তরে ব্রহ্মার চারটি মুখই চারবারে একটি বাক্যই উচ্চারণ করল, তামাকু, তামাকু, তামাকু, তামাকু। শ্লোকটা আমি মুখস্ত করে ফেলেছি, ভাবছি কোনও সিগারেট কোম্পানিকে দিয়ে দোবো।

—শ্লোকটা শুনি। পারলে আমিও মুখস্ত করে আমার বউকে বলব। মেরে ধরে আমাকে সিগারেট ছাড়িয়েছে। তুমি জান, আই ওয়াজ এ চেন স্মোকার। একসময় এমনও ভেবেছিলুম, সিগারেটের বদলে বউকে ছেড়ে দিলে কেমন হয়! তারপর একদিন কলকাতার এক বিখ্যাত ক্লাবে আমার সঙ্গে ডিনার খেতে গিয়ে দেখলে মেয়েরা ফসফস করে সিগারেট টানছে। ছেলেরা যত না টানছে মেয়েরা তার চেয়ে বেশি টানছে। তখন আমাকে সারা দিনে এক প্যাকেট স্যাংসান করেছে। শ্লোকটা বলো। ওটা শুনিয়ে আর এক প্যাকেট যদি আদায় হয়।

—বাংলাটা তো বললুম।

—আরে ধুর, সংস্কৃতে না বললে বিশ্বাস করবে না, শ্রদ্ধাও আসবে না।

—তাহলে শুনুন, বড়োজাঃ পুরা পৃষ্টবান্ পদ্মযোনিং/ধরিত্রীতলে সারভুতং কিমস্তি!/চতুর্ভিমুখৈরিত্য বোচদ্বিরিঞ্চিস্তমাখু স্তমাখু স্তমাখু স্মতাখুঃ!!

—কাগজে লিখে দাও।

—আপনাকে বইটাই দোবো। পড়ে দেখবেন, উপন্যাস কাকে বলে, শামুকের মতো চলন। কান্না পেয়ে যাবে।

—কেন, দুঃখে?

—না, না, যন্ত্রণায়। অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া গলব্লাডার অপারেশানের মতো।

—তুমি তো আচ্ছা ঠোঁট কাটা, লেখকের সামনে তার লেখার সমালোচনা করছ!

—কেন করব না! লেখকদের মস্ত সুবিধে লিখেই খালাস। নিজের লেখা ফিরে আর পড়তে হয় না। যে কোনও একটা লেখা মলাট ছিঁড়ে পড়তে দিলে এই মন্তব্যই করবে। পর পর সাতটা দেশলাই

কাঠি জ্বলল আর নিবল, সিগারেট কিন্তু ধরল না। এরই ফাঁকে এক লাইন রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে গেল, যতবার আলো জ্বালাতে চাই। এর মধ্যেই তৈরি হল দর্শন, কোন কাঠি যে জ্বলবে কখন? গোটা ভারতবর্ষটাই স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে ভিজে বারুদের মতো, একমাত্র টেররিস্টদের বারুদই শুকনো আছে। স্বামীর গদিতে স্ত্রী। একটা বাছুরের আঠাশটা বাচ্চা। প্রধানমন্ত্রীকে বুবু করছে নিজের দলের মেম্বাররা। একটা স্টেটে ছিয়াত্তরটা মন্ত্রী। এত বড় বিজ্ঞাপন, ওয়ান স্ট্রাইক ম্যাচ, কাঠি কিন্তু জ্বলে না।

—এ গুলো সব তোমার কথা।

—ওই আর কী! শংকর সিগারেট ফেলে দিয়ে ঘরে এসে বউকে জাগিয়ে বললে, মাথাটা ভীষণ ধরেছে। বউ বললে, আমার পাশে শুয়ে পড়ো লক্ষ্মী ছেলের মতো।

—অ্যায়, ঠিক দাওয়াই। আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি।

রুগি অসহায়ের মতো বললে, আমাকে তো কিছুই দেখলেন না।

—সারা শহরের এত বড় বড় স্পেস্যালিস্ট আপনাকে দেখেছে, যে আমার আর যেখার কিছু নেই। আপনার সব দেখাই হয়ে গেছে কেবল পাকা দেখাটাই বাকি।

—আচ্ছা, এই যে শুনছি, আমার লাম্বার পাংচার করা হবে।

—লাম্বার পাংচার! সে আবার কী! ম্যানেনজাইটিস হয়েছে না কী!

—না, বলছে, ওখান থেকে ফ্লুইড নিয়ে কী একটা স্পেশ্যাল টেস্ট করবে।

—টেস্ট করে কী দেখবে?

—বিশ বছর আগে আমাকে একবার কুকুরে কামড়েছিল।

—এর মধ্যে আবার কুকুর ঢুকে গেল! বাড়ির না রাস্তার?

—বাড়ির।

—ইনজেকসান দেওয়া ছিল?

—না। আবার সাত বছর বয়েসের সময় বাঁদরে কামড়েছিল।

—কোনও সময় অ্যান্টির‍্যাবিস নিয়েছিলেন?

—না।

—এত বছর যখন কিছু হয়নি, তখন আর কিছু হবে না।

—না, ওঁরা বলছেন, রাবিজ এমন একটা ব্যাপার যে পরের জন্মেও হতে পারে।

—অ, বিয়ের মতো, একই বউ জন্ম জন্মান্তরে ঘুরে ঘুরে আসছে! শুনুন, আমি বলি কী, ভালো একটা নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে থরো টেস্ট করিয়ে রোগটা আগে ধরুন। তা না হলে কোনও চিকিৎসাই হবে না।

ওপাশে দাঁড়িয়েছিল ছেলে। সে বললে, নার্সিং হোমেই তো ছিল। জামিনে খালাস আছে। রিপোর্ট করার কথা। কিছুতেই যেতে চাইছে না। বলছে, বাড়িতে হোমলি পরিবেশে মরতে চাই। এটা কোনও কথা হল। দু'মাস হয়ে গেল। আজ এটা, তো কাল ওটা। জোরে টিভি চালাবার জো নেই। রাস্তায় বেরলেই সমালোচনা, বাপ মৃত্যুশয্যায়, ঘণ্টা না বাজিয়ে টিভি চালাচ্ছ! সব কিছুর একটা লিমিট আছে। প্রথম প্রথম ভাল লাগে, শেষের দিকে আর ধৈর্য থাকে না।

ডাক্তারবাবু বললেন, তা ঠিক, গরু হলে কসাইখানায় পাঠিয়ে দেওয়া যেত; মানুষ হয়েই মুশকিল। এই এজ অফ টেকনোলজি আর ইন্টারনেটের যুগে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে মহা সমস্যা। আচ্ছা আজকাল কাগজে শ্মশানের টেলিফোন নম্বর দেয় কেন? পাঁচটা শ্মশানের ফোন নম্বর? অ্যাম্বুলেনস, নার্সিংহোম, ডাক্তার হোটেল, রেস্তোরাঁরটা বুঝি, শ্মশানকে ডাকলেও মোবাইল চুল্লি পাঠাবে না। কেরোসিন তেল আর দেশলাই কাঠি ছাড়া বাড়িতে সৎকার সম্ভব হবে না। শ্মশান ভগবানের রেস্তোরাঁ হয় ত, তবে মানুষ সেখানে টেব্‌ল বুক করবে না ফোন করে! চিতা বিছানাই, শেষ শয্যা, তবে হোটেলের বিছানা নয়। শ্মশানের ফোন নম্বর দেয় কেন!

জুনিয়ার বললেন — স্যার একেই বলে দূরদর্শিতা। ধরুন বাবা মারা গেছে। এন আর আই ছেলে বউ নিয়ে আমেরিকা থেকে উড়ে এসেছে। ফোন করছে, হ্যালো কেওড়াতলা, লাইন ক্লিয়ার! ক'জন? সাতজন। আটটা বুক করলুম। ও. কে। ওই আটে একটা ডামি খাট এসে গেল। চাদর চাপা। ফুলটুল দেওয়া। অ্যাভারেজ এক ঘণ্টা হলে, সাতটা লাশে সাতঘণ্টা। সাতঘণ্টা পরে বাবার লাশ এল আর ঢুকে গেল। বুকিং ফি পাঁচশো। কিছুই না। একজন ব্যবসাদার এই সাতঘণ্টায় সাতলাখ কামাই করবে। টাইম ইজ মানি। ইচ্ছে করলে, বেকাররা, যাদের কাছে টাইম ইজ পর্ভাটি অ্যান্ড সাফারিং তারা জ্যান্ত মড়া হয়ে ঘণ্টা বেসিসে কিছু রোজগার করে নিতে পারে। কেরোসিন তেলের লাইনে টিন, জলের লাইনে বালতি, রেশনের লাইনে টিন, পোড়ার লাইনে ডামি। যুগ আরও একটু অ্যাডভান্স করলে কুরিয়ার সার্ভিস।

ডেডবডি গেল কুরিয়ার সার্ভিসে, লেবেল সাঁটা দেড় কেজি বাপের কী মায়ের ছাই ফিরে এল ওই কুরিয়ার সার্ভিসে। ডেড লেটারের মতোই ডেডবডি। যখন ছাই এল বাড়িতে কেউ নেই। কাজের প্রাচীনা মহিলাটি বললে — ও মা! কতদিন পরে বাজারে বাসনমাজার ছাই ছেড়েছে গো কোম্পানি! ছাইয়ের মতো জিনিস আছে! বাসন যা পরিষ্কার হয় না! ফুরলে আবার পাওয়া যাবে?

—এ ছাই সে ছাই নয় গো মেয়ে, জীবন ফুরলে তবেই মিলবে এই ছাই। নাও, একটা সই দাও। যা হয় একটা খচাখাঁই মেরে দাও। এটা হল বাবুর বাবার ছাই।

—তিনি তো মারা গেছেন।

—আর কী বলব বল। মানুষ কী কর্পূর, যে মরে যাবে! দেড় কেজি ছাই, পাক্কা ওজন।

কাজের মহিলা শিউরে উঠল, বাবার ছাই! বাইরে দরজার কোণে রেখে দাও। কী ওলুক্ষণে জিনিস!

—তোমার, আমার সকলেরই তো ওই এক গতি। নেতা হলে হেলিকপ্টারে উঠত, ধর্মগুরু হলে সমাধি।

ঘর আপাতত খালি। রাত ন'টা কী সাড়ে নটা। দূর থেকে সানাই ভেসে আসছে। বেহাগে আলাপ চলছে। ওখানে একটা বাড়ি আছে, বিয়ের জন্যে ভাড়া দেয়। শ্রাবণ মাস। আজকাল বিয়ে আর শ্রাদ্ধ বেশির ভাগই বাড়িতে হয় না। শ্রাদ্ধ হয় যে কোনও একটা আশ্রমে।

বুগির তন্দ্রা এসেছে। একটা ঘোরের মতো। কপালে একটা ঠাণ্ডা কোমল হাত। নববধূর চুড়ির রিন্‌রিন্‌। জুঁই ফুলের গন্ধ।

—কে?

—আমি রমা।

—তুমি কোথা থেকে এলে! হাতটা বরফের মতো ঠাণ্ডা।

—তমসা নদীর তীর থেকে।

—মালা পরেছ বুঝি?

—তুমিই তো পরিয়েছিলে চল্লিশ বছর আগে এই সাত শ্রাবণে। আবার কানের কাছে মুখ এনে গেয়েছিলে পান খাওয়া রাঙা ঠোঁটে — আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল। মনে পড়ে। আমিও

তো তেমনি ছিলুম, উত্তরে গেয়েছিলুম পূর্ব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি। হৃদয় নদীর কুলে কুলে জাগে লহরী।

—কী করতে এলে! যাও, তোমার ওপর আমার অভিমান হয়েছে।

—কেন?

—আগে গেলে, তা যাও। দিন ফুরোলে তুমি আর করবে কী! কিন্তু বলেছিলে, গিয়েই ডেকে নেবে পাঁচ বছর হয়ে গেল। এখন মালা পরে ঢং করতে এসেছ?

—আমি তো তোমাকে কত বার কত ভাবে ডাকছি। শুনতেই পাও না! কেবল বাঁচার চেষ্টা করছ। আর বেঁচো না, সবাই বিরক্ত হচ্ছে। কর্তব্য করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। তিনমাস আগেই মুসৌরি যাওয়ার টিকিট কাটা আছে। বুড়ো! তুমি কিছুই জান না। তুমি মরবে বলে সবাই দেখতে [illegible] নছে দিগ্‌বিদিক থেকে। এ যাত্রায় বেঁচে গেলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে তোমার সেই গৃহত্যাগের মতো হাস্যকর হবে। ল্যাম্প পোস্ট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলে!

—এরা তো করছে খুব!

—আরে ধুত্! এ তো কর্তব্য! প্রেম কোথায়! পাঁচতারা হোটেলের পরিবেশন। কেতা আছে হৃদয় নেই। আর থাকে না। এইবার চলে এস লক্ষ্মীটি। এই শ্রাবণে, আমি একা বসে আছি নদীর তীরে অন্ধকারে। তোমাকে না নিয়ে ওপারে যাই কী করে। সুদূর কোন্ নদীর পারে, গহন কোন্ বনের ধারে।

—আমি তো খুব চেষ্টা করছি রমা!

—না, না, তোমার চেষ্টায় খুব ফাঁকি আছে। যে ভাবে মানুষ বাঁচার চেষ্টা করে ঠিক সেই ভাবে মরার চেষ্টা করো। সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে/মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ।'

—দাঁড়াও, তুমি যাচ্ছ কোথায়!

চটকা ভেঙে গেল। অনেক রাত। সানাই আর বাজছে না। কটা কুকুর দূরে চিৎকার করছে। সামনের দেওয়ালে ঝুলছে অদ্ভুত সেই ছবিটা। একটা হাতের ওপর আর একটা হাত। মৃত্যুর কয়েক সেকেন্ড আগে রমা হাতটা ধরে ভাষাহীন ভাষায় বলতে চেয়েছিল, 'চলো, চলো। এ জন্মের মতো আর হয়ে গেছে যা হবার।'

ঋতুরাজ গ্রীষ্ম

একটি সিঁদুরে আম, এক ঝলক ফোসকা পড়ানো রোদ, একটা ডুমো মাছির বুজুর বুজুর সঙ্গীত, একখণ্ড লাল মেঝে, একটা কাকের শুকনো ডাক, আর স্থির পত্র বৃক্ষরাজি, আর কি চাই? গ্রীষ্মের চিত্র সম্পূর্ণ। গাছের ছায়া, তা-ও যেন গরমে গলে গেছে। একটা গোরু চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে শুতে পারছে না, পাছে গায়ে ছেঁকা লেগে যায়।

ঋতুদের মধ্যে গ্রীষ্ম হলো পুরুষ। গ্রীষ্মের দাপটে বর্ষা কেঁদে ফেলে। শরৎ আসে কাশফুলের উপহার নিয়ে বর্ষার অভিমান ভাঙাতে, হেমন্ত আনে শিশিরের গয়না। শীত ঢেকে দেয় কুয়াশার আঁচলে। ক্ষণ বসন্ত দখিনা বাতাসের ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেয় সেই আঁচলে। ঋতুরাজ গ্রীষ্ম জ্বলন্ত সন্ন্যাসীর মতো ফিরে আসেন প্রব্রজ্যা শেষ করে। এই আবর্তনের সাক্ষী আমরা।

গ্রীষ্মকে আমি ভালো ভাবে দেখেছি। গ্রীষ্ম আমরা প্রাণের বন্ধু। আমার শৈশব উন্মিলিত হয়েছিল গঙ্গার ধারের ছোট্ট এক ঢলঢলে গ্রামে। বাড়িটাও ছিল গঙ্গার ধারে। আর আমার পরিবার পরিজনও ছিলেন রসিক মানুষ। অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, কষ্ট, মৃত্যু— সবই ছিল। ও-সব কেউ গ্রাহ্য করতেন না। স্পার্টান চরিত্রের মানুষ ছিলেন সব। একটাই কথা ছিল, প্রেমসে বাঁচো। প্রকৃতির কণ্ঠলগ্ন হয়ে বাঁচো। বাংলায় তেমন সুবিধে করা যাবে না ভেবে, ইংরিজিতে বলতেন— All you have is your time on this earth. Use it while you can. পৃথিবীতে এসেছো নাঙ্গা হয়ে। সঙ্গে কিছুই আনোনি বাপু। একটি সম্পত্তি সঙ্গে করে এনেছো, সেটা হলো সময়। সময়ের মালিক তুমি। সেই সময়ের ব্যবহার করো যখনই সময় পাবে। আমের মতো, জামের মতো, জামরুলের মতো, কাঁঠালের মতো রসালো হয়ে বাঁচতে শেখো। আবার ইংরিজি, Live with Nature.

বৈদ্যুতিক পাখার প্রবেশ নিষেধ। কারণ পাখা, গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর, স্তব্ধ-বাতাস রাত্রিকে চরিত্রহীন করে তোলে। দিবা দ্বিপ্রহরে দোতলার

ঘরের সব জানালা খুলে দাও। বৈশাখের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করো। আকাশ যেন স্টিলের চাদর। পাখি ডানা মেলতে ভয় পাচ্ছে, যদি পালক পুড়ে যায়। টিনের চালে রোদ ঝলসাচ্ছে। পাড়ার ডাকসাইটে হুলো ভুলে সেই চালে পা ফেলে ছ্যাঁকা খেয়ে তরতরিয়ে পালাল। উত্তাপ সে আন্দাজ করতে পারেনি। তার লক্ষে ছিল ক্লান্ত এক চড়ুই। ছোট্ট ঠোঁট দুটি ফাঁক করে সে একটু বাতাসের প্রত্যাশায় ছিল। বেড়ালের দ্রুত পলায়ন দেখে পাখি ডাকল চিরাপ, চিরাপ। যেন বলতে চাইল, চিয়ার আপ, চিয়ার আপ।

দক্ষিণের ঋজু, ঋজু সাবেক আমলের লম্বা লম্বা গরাদ লাগানো জানালা দিয়ে ফিনফিনে বাতাস আসবে। গরম বাতাস। মাঝে সূক্ষ্ম তারের মতো একটু ঠাণ্ডার বুনোন। নিমের পাতা যেন কাঁপতে গিয়েও প্রলোভন জয় করে স্থির হয়ে যাবে। লাল মেঝেতে একটি মাদুর। তার ওপরে ক্লান্ত একটি শরীর। দিবানিদ্রার ব্যর্থ চেষ্টা। দরদরে ঘাম। একটি হাতপাখার ক্লান্ত চলন। মাঝে মাঝে উফ্ আফ্ শব্দ। জমজমাট গ্রীষ্মের সে কি আনন্দ। প্রান্তরের বুক চিরে পথ চলে গেছে ক্লান্ত পথিকের মতো। রবীন্দ্রনাথের সেই পথ শুধু দেখেননি, অনুভব করেছিলেন, 'কী প্রখর রৌদ্র। উহু-হুহু। এক একবার নিশ্বাস ফেলিতেছে আর তপ্ত ধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে।' রাজপথের তপ্ত নিশ্বাস। একমাত্র কবিই পারেন সেই নিশ্বাসের স্পর্শ নিতে।

গ্রীষ্ম না থাকলে জলের মর্ম কে বুঝত! শান্ত দিঘি। গাছের ছায়া। এক পাল হাস। একপাশে একটি বেড়া। কয়েকটি চালা বাড়ি। পায়ে চলা পথ। ধারে ধারে আগাছা। ঘাসের শীর্ষে স্থির পক্ষ ফড়িং। আকাশ নেমেছে নির্জন প্রেমে। ঝরা ফুল ভাসছে জলে। বৃহৎ কোনো মাছ মাঝে মাঝে ঘাই মারছে। যেন গরম জল আর ঠাণ্ডা জল মেশাবার দায়িত্বটা তারই ওপর বর্তেছে। গাছের ডালে চামচে ঠোঁট একনিষ্ঠ মাছরাঙার অসীম প্রতীক্ষা। অদূরে গাছের ছায়ায় একদল শালিকের মহা উত্তেজিত আমসভা। যেন ভেঙে যাওয়া পার্লামেন্টের নতুন নেতা নির্বাচিত হচ্ছে। চন্দ্র শেখর বা রাজীব! দূরে দেবীলাল ঝিম মেরে আছেন তৃষ্ণার্ত বায়সের মূর্তি ধরে। কোথাও কোনো ঝোপের আড়ালে এক জোড়া ঘুঘুর হেঁচকি। গোটা ভারত ভিটেয় কবে তারা চরতে পারবে, এই আপসোস।

হঠাৎ মশ করে একটা সরস শব্দ হবে। এক ঝলক তরল হাসি। গ্রীষ্মের ভরা দুপুরেই তো গ্রামের পরিরা আসে জলের ধারে। ঝকঝকে দাঁত বসছে শাদা জামরুলের শরীরে। দংশিত হওয়ারও কি সুখ। ডুরে শাড়ি। বুকের ওপর গামছা ফেলা। নিটোল শীতল শরীর উত্তাপ ছড়ায় যত বাইরে। ঘাটের ছায়ায় সখীদের একান্ত মিলন। জামরুল আর ভীমরুল ছাড়া গ্রীষ্ম যেন মানায় না। ভীমরুলের ভোঁ ভোঁ ঝিম ধরানো ডাক। যেন ভারিক্কি চালের কর্তা আমবাগান পাহারা দিচ্ছে। রোদের কুঁচো যেন এক একটি বোলতা। মৌমাছি যেন গ্রীষ্মের নেশা। চাকের খোপে খোপে মুখ জুবড়ে পড়ে আছে। লুঠেরার দল, আম ফুল, জাম ফুল, লিচু ফুল, নিম ফুল, যেখানে যত মধু আছে সব এনে জড় করছে চাকের সরাইখানায়। পিঁপড়ে যেন তীর্থযাত্রীর দল। পিলপিলিয়ে চলেছে এক চটি থেকে আর এক চটিতে। বড় ব্যস্ত কাঠঠোকরা। সারাটা দুপুর গাছে গাছে তার ঠকঠকানি। মানুষের হৃদয়ে যেন হাতুড়ি পিটছে। পক্ষীজগতের নিলামবালা। ফড়িং হলো প্রাণীজগতের হেলিকপ্টার।

জীবন যখন শৈশবের কোল ছেড়ে, কৈশোরের ধাপ ধরে যৌবনকে ছুঁতে চাইছে, সেই সন্ধিক্ষণে গ্রাম অথবা আধাশহরের গ্রীষ্ম বড় মধুর। একটু কষ্ট দেয় অবশ্যই, তবে সেই বয়সে মানুষ হাঁসের মতো কষ্ট ফেলে আনন্দটাকে গ্রহণ করতে পারে। তরুণ জীবন টাটকা ব্লটিং পেপারের মতো বেঁচে থাকার রসটুকু শোষণ করে নেয়। যে-দাবদাহে মানুষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অর্থ আর বিত্তবাসনায় জীবনতরুর দিনের পাতা ঝরাতে থাকে একটি একটি করে, তখন তার জীবনের কৈশোর পরোয়া করে না কোনো কিছুর। বাঁচতে ভালো লাগে বলে বাঁচার উন্মাদনা। মরতে ভয় করে বলে নেশার জগতে বাঁচা নয়। বেহিসেবী না হলে গ্রীষ্মের মহিমা বোঝা সম্ভব নয়। রোদ লাগালে সানস্ট্রোক হবে। ফল খেলে কলেরা হবে। জল খেলে জন্ডিস হবে, এইসব ডিফেনসিভ খেলায় জীবনের ফুটবল তেমন জমে না। গোল করো, গোল খাও।

গ্রীষ্ম হলো কিশোরের, গ্রীষ্ম হলো শিশুর। বেপরোয়ার ঋতু। গ্রীষ্ম হল তপস্বীর। কষ্টের বোধ থাকলে গ্রীষ্মকে পাওয়া যাবে না। আমরা যখন কিশোর তখন মনে আছে, দুরন্ত দ্বিপ্রহরে আমরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকতুম, কখন বড়রা ঘুমিয়ে পড়বেন। যতক্ষণ না

ঘুমোচ্ছেন, ততক্ষণ ভীষণ মনোযোগী ছাত্র। হঠাৎ জানালার বাইরে তার আবির্ভাব। আমার মতোই আর এক কিশোর। আমার আগেই সে হয় তো নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে। ফাঁকি দিতে পেরেছে শাসকশ্রেণীকে। একালে যাঁরা আরো প্রবল রূপ ধারণ করে কৈশোরটাকেই হত্যা করে বসে আছেন।

গণিতের খাতা, অনুবাদের বই, ব্যাকরণ, সব তালগোল পাকিয়ে তলিয়ে গেল। চোরের মতো পা টিপে টিপে ভর দুপুরে পলায়ন। পাকা মানুষের, বিষয়ী মানুষের কল্পনার বাইরে। গরমে, রোদে যখন দমবন্ধ হয়ে আসে, মাটিতে পা ফেলা মাত্রই যখন ফোস্কা পড়ার মতো অবস্থা, ছাগলেও যখন ছায়া খুঁজছে, সেই সময় দুই উন্মাদ কিশোর গ্রীষ্মের অভিসারে চলেছে। জীবনের পাঠশালা থেকে রুদ্রের পাঠশালায় চৈত্রের ভৌতিক বাতাসে প্রান্তরের যত্রতত্র ধুলোয় ঘূর্ণি বাউলের মতো নেচে উঠছে। ঝরাপাতা ওড়ার শব্দে অদৃশ্য মানবীর আঁচলের উপস্থিতি। কল্পনাকে একটু প্রসারিত করলেই দেখতে পাওয়া যায়, আমবাগানের নিরালা ছায়ায় একটি কূপ। সেই কূপে জল তুলছে যে, সে আমাদের বাতাসী নয়, চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি। ভিক্ষু আনন্দ স্বয়ং গ্রীষ্ম। তৃষ্ণার্ত। তাঁর গম্ভীর প্রার্থনা :

জল দাও আমায় জল দাও।
রৌদ্র প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ হা,
আমায় জল দাও।
আমি তাপিত পিপাসিত,
আমায় জল দাও।
আমি শ্রান্ত, হা
আমায় জল দাও।

শীত আমাদের মোলায়েম একটু রোদ্দুর ছাড়া কিই বা দিতে পেরেছে। আর রঙ, বেরঙের বাহারী কিছু ফুল। ফুল নিয়েই সন্তুষ্ট। ফল সব বাইরের। না আপেল, না কমলা।

গ্রীষ্ম তো ওই একটা জায়গায় টেক্কা মেরে গেছে শীতকে। চৈত্রের আমবাগানে মধ্যদিনে ঢুকলে নেশা ধরে যাবে। আম্রমুকুলের মাতাল করা গন্ধ। সর্বত্র মধু বর্ষণের পুটপুট শব্দ। ফলসার চ্যাটালো পাতায় কচি সবুজ। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে নাকছাবির মতো হলুদ হলুদ ফুল। ফল আসছে। গাছের তলায় দাঁড়ালে, মাথায় ঝরে পড়বে কুঁড়ি

ফাটা পাপড়ি। জামের উঁচু উঁচু ডালে, শিল্পীর আঁকা ছবির মতো লিটির লিটির জামের মুকুল। পেয়ারা গাছে মিল্কপাউডার খাওয়া ছুঁচোর মতো। ছ্যাতরানো ফুল। বেলগাছ ছেয়ে গেছে সবুজ ত্রিপত্রে। পাতার খাঁজে খাঁজে সবুজ পান্নার মতো বেলের থোলো। হলুদ গেরুয়া। রোদের কাছে সবাই ঋণী।

দুই কিশোর হাতে গাবভেরেণ্ডার ডাল নিয়ে মেটে পথ ধরে চলেছে। কোথাও ছায়া নেই। ফুস্ করে বাতাস ফুঁ মারল। ছাইগাদা থেকে শাদা পাউডার লেজের ঝাপটা মেরে গেল। রাস্তার প্রতিটি বালি আর কাঁকরের দানা জ্বলছে; কিন্তু গাছের পাতা সতেজ, সবুজ। রোদ শুষছে। সূর্যই যে সবুজের কারণ। রাস্তা চলেছে সামনে, চালা আটচালার জটলার ভেতর দিয়ে।

আমাদের নাকে হঠাৎ একটা সুগন্ধ এসে লাগবে। গুড় আর চিনি একসঙ্গে পাক হচ্ছে। এই হলো গোপালদার বাতাসার কারখানা। তিনজন ভারিক্কি চেহারার মানুষ, যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত বেশ-বাসে, চ্যাটাইয়ের ওপর অদ্ভুত কায়দায় একের পর এক বাতাসা পেড়ে চলেছেন। বিস্ময়কর দক্ষতা। ফুটো পত্র থেকে মোটা রসের ধারা নেমে আসছে। হাত যেন ঘুরছে দক্ষিণী নাচের মুদ্রায়। আর এক দিকে কাঠের গোল বারকোশে পাতা হয়েছে শাদা সুতো। বিশাল কড়ায় ফুটছে চিনির রস। কারিগর তাওয়া মেরে দেখছেন পাক কেমন হলো। হিসেব বড় সাংঘাতিক। এক সুতো, দু সুতো, সাত সুতো। কোন পাকে মিছরি জমবে, মিছরির ওস্তাদই তা জানেন। রস ঢালা হবে কাঠের ওই গোল থালায় সুতোর জালির ওপর। রস ঠাণ্ডা হলেই জমে যাবে দানা মিছরি। চালার ভেতরের বাতাস উনুনের গরমে থিরথির কাঁপছে। বাইরের জমি এত উত্তপ্ত, কে এক খুরি জল ছুড়ল, তৃষ্ণার্ত বসুন্ধরা নিমেষে টেনে নিল। এই গ্রীষ্মে মিছরি আর বাতাসার কাটতি খুব বেশি। ফুল বাতাসার এক একখানা জলে ভিজিয়ে গালে ফেলো, পিত্তনাশ হবে। কাঠের ওপর খড়ির দাগ টেনে গোপালদা হিসেব রাখছেন, ক'থালা মিছরি নামল।

আমরা গুড়-চিরি গন্ধ নাকে নিয়ে, গায়ে খানিক উত্তাপ মেখে এগিয়ে যাবো সামনে। আরো কত বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে। বাঁই বাঁই করে চাক ঘুরছে। কুমোর পাড়া। লাল লাল হাঁড়ি, কলসি, খুরি, ভাঁড় রোদে শুকোচ্ছে। চাকে তৈরি হচ্ছে মাটির গেলাস।

অভয়দার হাতের কেরামতিতে আমরা হাঁ হয়ে যাবো। দেখলেই মনে হয় সূর্য দিয়ে তৈরি। রসের ছিটেফোঁটাও নেই। অভয়দার চালার ওপর লতিয়ে উঠেছে লাউগাছ। সকালের ফোটা ফুল দ্বিপ্রহরে চুপসে গেছে। ছাইয়ের গাদায় একটা ধুঁদুলের চারা চোখ মেলেছে। ধুলোর গাব্বুতে চড়াই নেমেছে চান করতে।

আমরা দু'জন এদিক-ওদিক তাকাই। একজনকে আমরা প্রায়ই খুঁজি। আমাদের বিশ্বাস এই জায়গাটাই সেই জায়গা। এইখানেই আমরা পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুণকে খুঁজে পাবো। বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'চৈত্রমাসের সংক্রান্তি। সারাদিন বড় রৌদ্রের তেজ ছিল, সন্ধ্যার সময় একটু একটু বাতাস বহিতেছে। গোঁসাই পাড়ায় চড়কের ঢাক এখনও বাজিতেছে, মেলা এখনও শেষ হয় নাই।' কোনো এক দাওয়ায় আমরা ঠাকুরণকে দেখতে পাব। রোজ সন্ধের পর একটু একটু জ্বর হচ্ছে। সর্বজয়া বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বুড়িকে। পরের দাওয়ায় শুয়ে আছেন তিনি ছেঁড়া মাদুরে। মাথার কাছে মাটির ভাঁড়ে জল। আমাদের গভীর বিশ্বাস ভাঁড়টা তৈরি হয়েছিল অভয়দার চাকে। পেতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যে চার আনায় বাঁধা দিয়ে চাল কেনা হয়েছে। ঠাকরুণ জ্বরের তৃষ্ণায় মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটির ভাঁড় থেকে খাচ্ছেন।

চৈত্র সংক্রান্তির সঙ্গে এক অসহায় বৃদ্ধা, জল, জ্বর, তৃষ্ণা, মেলা, চড়কের ঢাক সব এক হয়ে একাকার কল্পনা। আর একটু এগোলেই বাঁড়ুজ্যেদের পোড়ো ভিটে। আমরা দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকি প্রতীক্ষায়। একটু পরেই দুর্গা আসবে, সঙ্গে আসবে বেহারী চক্কত্তির মেয়ে রাজী। তারা ফিরছে গাজনের মেলা থেকে। সন্ধেবেলা ফোটে সন্ধ্যামণি, নয়নতারা। কোনো ভুল হয় না, তাহলে দুর্গা আর রাজী কেন আসবে না! এই ছিল দুই কিশোরের যুক্তি। 'খুকীর পরনে ফর্সা কাপড়, আঁচলের প্রান্তে কি সব পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা।' আমাদের কল্পনার চোখের সামনে ঘটছে সেই নাটক। বাস্তব বলতে, বাঁড়ুজ্যেদের পোড়ো ভিটে উত্তপ্ত নিদাঘ, ঝোপঝাপ, গাছগাছালি। 'বুড়ীর মুখ দিয়া বেশী কথা বাহির হইল না। প্রবল আগ্রহে সে শীর্ণ হাত বাড়াইয়া জ্বরতপ্ত বুকে জড়াইয়া ধরিল।'

হঠাৎ আমাদের মনে হত গ্রীষ্মের এই ভয়ঙ্কর দুপুরটাই ইন্দির ঠাকরুণের জ্বরতপ্ত বুক। বেড়ার গায়ে সবুজ একটি লতা, কি ছোট একটি ঝোপ, আমাদের দুর্গা আর রাজী। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বুকে শীতল

সান্ত্বনা। অদূরেই বসাক জমিদারদের মজা ডোবা। এতই তেষ্টা এই গ্রীষ্মের, সব জল টেনে নিয়েছেন আনাভি গণ্ডুষে। ধারে ধারে তাল, সুপুরি, খেজুর গাছ। ওদের যদি মা থাকত তাহলে তিনি বলতেন, রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বড় রোগা হয়ে গিয়েছিস, একটু ছায়ায় গিয়ে বিশ্রাম নে না বাপু! তাল গাছের যেমন বরাত; যার মাথায় অত হাতপাখার বোঝা, সে কেন একটু বাতাস দিতে পারে না। আমার সেই কৈশোরকালের বন্ধু হারু যথেষ্ট জ্ঞানী ছিল বয়সের তুলনায়। সে বলেছিল, লেজ আর হাতপাখা নিজেকেই নিজে নাড়াতে হয়। অপরে নাড়ালে হয় না। তালের অত পাখা সব বাতাসে নাচাচ্ছে। জ্ঞানবৃদ্ধ হারুর কাছেই শিখেছিলুম তুলসীদাসজির দোঁহা। যা আমরা খারাপ ধরনের বড় লোক দেখলেই মন্ত্রের মতো আওড়াতুম। সে এই সিড়িঙ্গে, মাথামোটা তাল, খেজুরকেই উদ্দেশ করে।

বড়ে বড়ে যো কহতে হেঁয় বড়েমে তাল খজুর।
যব ঠনকো ছায়া নহি, ফল পাওনকা দূর।

বড় হয়েছিস তো কি হয়েছে! সে তো তাল, খেজুরও বিশাল লম্বা। তলায় গিয়ে বোসো সামান্য ছায়াও মিলবে না উত্তপ্ত এই নিদাঘে। আর ফল? তার নাগাল পেতে হল ফায়ার ব্রিগেডের মই আনতে হবে। তাল, খেজুরের খরখরে ছায়ার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যেত সুকুমার রায়কে, 'গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায় ভীষণ রোদে ভাজা।' 'হাল্কা মেঘের পানসে ছায়া' চেটে দেখিনি, চোখে দেখেছি। পাতলা একটা আঁচলের মতো মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে। তালের কাঁদি পড়েছে। সবই শাঁস। টলটলে জলে ভরা হৃদয়ের মতো। রুদ্র গ্রীষ্ম পারে না সেই অন্তঃকরণের জল শুয়ে নিতে।

বসাকদের সেই মজা ডোবা আমাদের কাছে ছিল কিং সলোমনস মাইনের মতো। কাদা শুকিয়ে ফাট ধরেছে। বৃদ্ধার ত্বকের মতো। আর সেইখানে সামান্য খোঁচাখুঁচি করলেই বেরিয়ে পড়ে একটি আনি কি দুআনি, নিদেন কয়েকটি ডবল পয়সা। তখনো একালের হাল্কা ধরনের ফক্কিকারি নয়া পয়সার চল হয়নি। এক আনায় সেকালে অনেক কিছু পাওয়া যেত। একটি বড় তালশাঁস সন্দেশ। চারটে আলুর চপ। আটটা গুলি লজেনস। কপর্দকহীন দুই কিশোরের কাছে সেই অর্থ ছিল সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির মতো। আমাদের গবেষণার বিষয় হতো, কোথা থেকে আসে এই অর্থ। এ কি ধরিত্রীর দান! বর্ষায় ডোবাটা যখন

টইটম্বুর পুকুর হয়ে যায়, তখন হয়তো পাড়া-প্রতিবেশী মহিলারা সন্তানের মঙ্গলকামনায় মানসিক করা এই অর্থ জলকে দান করেন। আমাদের তখন আপসোস হতো, সমুদ্র কেন শুকোয় না! আমরা একবার একটা সোনার দুল পেয়েছিলুম, সেটাকে আবার মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছিলুম। অন্যের অলঙ্কার আমরা নিতে পারি না। সে হবে চুরির মতো। আমরা হাঁ করে খেজুরগাছের খরখরে পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। গ্রীষ্মের হাপর থেকে ফুস্ বাতাসে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। অধ্যবসায়ী কাক ঠোঁটে পাতা কামড়ে ঝুলছে। তার একটা সোঁটা চাই। আর কয়েকদিন পরেই সে মা হবে, বোশেখী কাক। এই তো বাসা বাঁধার সময়। দিশি খেজুরের থোলো নেমেছে। কিছু সবুজ, কিছু পেকে লাল। টুপটাপ ঝরছে। মহানন্দে আমরা কুড়িয়ে চলেছি। এমন কিছু সুস্বাদু নয়। আঁটি আর চামড়া। সামান্য কষা। তা হোক। একেবারে গাছ-পাড়া। আর কৈশোর হলো সর্বভুক। ভেসে যেত সাবধানবাণী, খাসনি পেট কামড়াবে।

আরও একটা আকর্ষণ তো ছিলই। অস্পষ্ট ভালো লাগা। ভেতরে একটা কিছুর পদশব্দ। আমাদের এই দ্বিপ্রাহরিক অভিযানের সঙ্গী হতো এক কিশোরী। হলুদ ফুলছাপ ফ্রক। একমাথা উড়ু উড়ু চুল। গলায় একটা লাল পাথরের মালা। সে-ই ছিল আমাদের কল্পনার দুর্গা। তার হাতে সত্যই একটা নারকেলের মালা। 'সেটা সে নীচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা।' বসাকদের জমিদারির একপ্রান্তে বিশাল আমবাগান। আমাদের কল্পনার অযোধ্যা। গাছের মাথায় হনুমানের লম্ফঝম্পটা ছিল নির্ভেজাল বাস্তব। নিজে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা আমাদের কল্পনা। অশোকবনও ছিল। আমাদের এই কিশোরী বান্ধবীর নাম ছিল মালা। তার উদ্ভাবনী বুদ্ধির অভাব ছিল না। আর ছিল অপর্যাপ্ত শাসন। বৈশাখের দুপুরে ভুতুড়ে বাতাস বইত হঠাৎ হঠাৎ। বোধহয় আমাদেরই কারণে। লিকলিকে বোঁটায় দুলছে কচি কচি আম। বাচ্চা হনুমানের মুখের মতো। বাতাসে দু'একটা ঝরবেই। তেল, নুন, লঙ্কা সহযোগে নারকেলের মালা থেকে কচি আমের টুকরো আর কোনো ঋতু আমাদের মুখে তুলে দেবে! পোড়ো দেবালয়ের ইট বের করা রকে আমরা বসেছি। মাঝখানে মালা। সবে নাক বিঁধিয়েছে, ফুটোয় একটা বেল কাঁটা। দুকানে দুটো সুতো। নারী হয়ে ওঠার আয়োজন।

এই সেই বৈশাখের দ্বিপ্রহর।

এমনই এক দ্বিপ্রহরে দেবদাসের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। শুরুটা হয়েছিল এইভাবে, 'একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে রৌদ্রেরও অন্ত ছিল না, উত্তাপেরও সীমা ছিল না। ঠিক সেই সময়টিতে মুখুয্যেদের দেবদাস পাঠশালা-ঘরের এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া, শ্লেট হাতে লইয়া, চক্ষু চাহিয়া, বুজিয়া, পা ছড়াইয়া, হাই তুলিয়া, অবশেষে হঠাৎ খুব চিন্তাশীল হইয়া উঠিল। এবং নিমেষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, এই পরম রমণীয় সময়টিতে মাঠেমাঠে ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়ানোর পরিবর্তে পাঠশালায় আবদ্ধ থাকাটা কিছু নয়।' আমরাও একজোড়া দেবদাস। আমাদের পার্বতী ছিল মালা। তবে আমাদের কারোর পিতাই জমিদার নারায়ণ মুখুয্যে ছিলেন না। জমিদারির আমবাগানও ছিল না। পরের বাগানেই আমাদের দ্বিপ্রাহরিক লীলা। জমিদারনন্দন দেবদাসের মতো ছোট হুঁকোয় আমরা তামাকও টানতুম না। আর আমাদের পার্বতী মালা, আমাদের কতটা ভালোবাসত তা জানার সুযোগ হয়নি। কারণ গ্রীষ্ম বারে বারে ফিরে আসে, জীবনের কৈশোর নদীর স্রোতের মতো একমুখী চলেই যায়, চলেই যায়। তবে এইটুকু বুঝেছিলুম মেয়েরা হল গ্রীষ্মের তালশাঁস। অত গরমেও টলটলে শীতল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মালার সঙ্গী-সাথীরা এসে যেত। শুরু হতো তাদের এক্কা-দোক্কা খেলা। আমরা তখন সেই মায়া ছেড়ে এগিয়ে যেতুম সামনে। একটু দূরেই ভিখুর কামারশাল। একজন হাপর টানছে। আগুনের ফুলকি উড়ছে ফুরফুর করে। লাল লোহার ওপর দমাস দমাস হাতুড়ি পড়ছে। দুটো মানুষ দরদরিয়ে ঘামছে। গোরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড়া পরানো হবে। সেটাকে আগুন জ্বেলে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। একটু পরেই লেগে যাবে চাকায়, সঙ্গে সঙ্গে জল ঢালা হবে। এক জোড়া চাকা মানে এক জোড়া বলদ। পিচগলা রাস্তায় ধুঁকতে ধুঁকতে মাল বোঝাই গাড়ি টানা। কবি লিখবেন :

বন্ধু, কাবার হতেছে বোশেখ এবার, কালবৈশাখী নাই,
রোদে ও গরমে বাসে আর ট্রামে আন্‌চান্‌ আইটাই।
পীচে ও পাখায়, ঘরে কি ফাঁকায়, বাতাসে হুতাশে হায়,
প্রাণের পরণে শিথিল এ দেহ খসিয়া পড়িতে চায়।

রোদের উত্তাপ, আগুনের উত্তাপ গায়ে মেখে আমরা আরো এগবো। কাঠ চেরাই হচ্ছে বংশীদার গেলায়। ফার্নিচার তৈরি হবে। ভিজে কাঠের মিষ্টি গন্ধ। বেড়ার ধারে ছাগল ছানা কচি গলায় মাকে

ডাকছে। খামোখা একটা গোরু হাম্বা রবে চমকে দিতে চাইছে থমথমে দুপুরকে। এই দুপুরও কবিতার দুপুর।

খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর ;
আকাশ উপুড় ক'রে ঢেলে-দেওয়া
অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ক কণ্ঠ কাক !
গান নয়, সুর নয়
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা—কিছু নয়
সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

গ্রামের সীমানা শেষ হল আদিগন্ত চষা খেত, ফুটিফাটা। ঘাসের গোছা রোদে পুড়ে ঝিরকুট। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে চালা একপাশে। বাঁখারির কঙ্কাল। এই কি সেই গফুর জোলার বাড়ি ! এই গ্রামের নামই কি কাশীপুর ? কাহিনীর শুরু কি এইখানেই ?

'সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিমঝিম করে যেন নেশা লাগে।'

গ্রীষ্মের কি নিষ্ঠুর রূপ, 'গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিচরণবাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে, তাহা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়।'

এই ভিটেতেই গফুরের বলদ মহেশ আমিনার ঘট ভেঙে জল খাবার অপরাধে প্রাণ দিয়েছিল। গ্রীষ্ম, তুমি অপরাধী ? না দারিদ্র্য অপরাধী, না কি জাত-পাত বিভাজনকারী উচ্চবর্ণের মানুষ অপরাধী ! আজও কি গফুর নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে মুখ তুলে বলছে না, 'আল্লা ! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টায় জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি কখনো মাপ ক'রো না।'

দু'সার বাবলা গাছের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ধোঁয়াটে পথ। অতি কাতার এক বাছুর মাতালের মতো টলতে টলতে চলেছে। ডোমপাড়ায় চ্যাটাই বুনছে দশ-বারোজন মেয়েমদ্দ। তিনটে শূকর ঘুরছে ঘোঁতঘোঁত করে। পথ বাঁক নিয়ে চলে গেছে গঙ্গার ধারে। জলে গুলেছে মধ্যদিনের সূর্য। বাতাস নেই। আকাশের নীল ঝরছে শুকনো গুঁড়োর মতো। শিবমন্দিরের লিঙ্গেশ্বর শুকিয়ে কাঠ। শুকনো বেলপাতা খসে পড়ে গেছে। কোনো মতে গোটা দুই আকন্দ ফুল পাথরের লিঙ্গের মাথায় ভারসাম্য বজায় রেখে স্থির হয়ে আছে। দেয়ালে উৎকীর্ণ মহাবীরের মূর্তি। কালো একটা কুকুর একটু ঠাণ্ডার খোঁজে আশ্রয় নিয়েছে বেদির তলায়। বাঁধানো বট। ছায়া ফেলেছে তলায়। একদল মৎস্যজীবী বসে আছে। কেউ জাল বুনছে, কেউ শুধু উদাস চোখে জলের দিকে তাকিয়ে বিড়ি ফুঁকছে। জল নেমে গেছে বহু দূরে। পাঁতায় সার সার চিৎ হয়ে আছে জেলে ডিঙি। সকলেই অপেক্ষায়। হঠাৎ একজন চিৎকার করবে, জোয়ার এসেছে, নৌকো ভাসা। সে যেন এক যুদ্ধ। অলস মানুষগুলি এক ঝটকায় নিজেদের তুলে ফেলবে বটের ছায়াবেদি থেকে। ডিঙিগুলো পিছলে নেমে যাবে জলে, এক একটা কেঠো কুমিরের মতো। জোয়ারের জলে মাছ আসবে সুমদ্র থেকে।

এই কি সেই শান্ত, শীর্ণ নদী। যার ভাষা-দর্শন পাওয়া যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনায় : 'স্বল্পতোয়া ক্ষুদ্র নদীটি শৈবালাদি জলজ উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ, কেবল স্নানের ঘাটটি পরিষ্কার। তীরে বালুকারাশি ভেদ করিয়া দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে কালো বালির সঙ্গে ঝির-ঝির করিয়া অতি ঠাণ্ডা নির্মল জল উঠিতেছে। নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামের প্রান্ত দিয়া বাহিয়া চলিয়াছে। অনেক দূর হইতে তাহার তীরবর্তী বাঁশঝাড়, বটগাছ ও বাঁশ-জলের বাঁশের উচ্চ অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে।'

সে-নদীর নাম হয়ত শীলাবতী। তাতে কিছু যায় আসে না। একই দৃশ্য, 'কলসগুলি ভাল করিয়া মাজিয়া রমণীগণ স্নানান্তে কলস ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে। কাহারও কলসীর মুখে পিতলের ছোট একটা তেলমাখা বাটি, তাহার উপর একটা কাঁচা আম। কলসীটি কক্ষে লইয়া তাহার অতি কষ্টে রৌদ্রোতপ্ত ধূলিবর্জিত বিজন গ্রাম্যপথ দিয়া চলিতেছে। কলসে জল ছল্‌ছল্‌ করিয়া বাজিতেছে, জলসিক্ত পদাঙ্ক দেখিতে দেখিতে মাটিতে শুকাইয়া যাইতেছে।'

এমন দৃশ্যে শিল্পী কেন প্রলুব্ধ হবেন না। একপাশে মাথায় তোয়ালে চাপা দিয়ে হাঁটুতে বোর্ড রেখে তন্ময় হয়ে আছেন শিল্পী মানিকদা। রঙভরা তুলি। চোখের সামনে নিজন-বিজন গ্রীষ্মলীলা, 'শান্ত নদীটি, পটে আঁকা ছবিটি। ঝিম্ ধরেছে, ঝিম্ ধরেছে গাছের পাতায়। পাল গুটিয়ে থমকে আছে ছোট্ট তরীটি।' আর কোথাও কি বসে আছেন, শিল্পী হেমেন মজুমদার? সিক্তবসনা সুন্দরীর দেহপটে নিমগ্ন হয়ে! বসন্তলাল দুপুরে বাড়ির স্টুডিওতে বসে তেল রঙে আঁকবেন স্টিল লাইফ গ্রীষ্মের উপাদানে। ধবধবে সাদা আচ্ছাদনে আবৃত গোল টেবিল। একটি ফুলদানি। যত রোদ, তত সাদা, কমলা, নীল আর লাল ফুল। একটি গেলাস। ভেতরে ঠাণ্ডা পানীয় বাইরে জলকণা জমে শিশিরের বিন্দু। একটি দ্বিখণ্ডিত লাল তরমুজ। আড় করে রাখা ইস্পাতের ছুরি। দ্বিখণ্ডিত পেঁপে। এক থোলা কালোজাম, জামরুল আর বুটিদার লিচু। কয়েকটি সিঁদুরে আম। একটা হলুদ বোলতা। পেছনে প্রায় সাদা সামান্য নীলচে একটা পর্দা। একগুচ্ছ লাল গোলাপ কোথাও রাখা যেতে পারে। গ্রীষ্মের স্থিরচিত্র সম্পূর্ণ।

আমিও গফুর জোলার মতো আকাশের দিকে মুখ তুলে বলতে পারি, 'আল্লা, এই কংক্রিট সভ্যতার বিচার করো। যারা গ্রাম কেড়ে নিয়ে বলেছিল, শহরের সুখে তোমকে রাখব, পীচের মসৃণ পথ, কল ঘোরালেই জল, বেতাম টিপলেই আলোর ভেল্কি দেখাব, অথচ তা হলো না, আমার গ্রামও গেল, শহরও গেল। আমার সেই ছবি আমি ফিরে পেতে চাই। নিয়ে যাও তোমার নগরসভ্যতা। আমার বাগান কোথায়!' যার 'বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ধূসর আকাশ হইতে সূর্যদেব জ্বালাময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। এলোমেলো বাতাসে পথের ধূলা ও গাছের শুষ্কপত্র উড়িয়া যাইতেছে। রৌদ্রকাতর উত্তপ্ত প্রকৃতির নিদাঘ-ক্লান্তিতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটা কোকিল এই নিদাঘ-মধ্যাহ্নে ও আম্রকুঞ্জের ঘনপল্লবদলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কুহু কুহু শব্দে কুহরিয়া উঠিতেছে। গ্রাম্য বালকেরা বিশ্রামসুখ পরিত্যাগপূর্বক ছুরি ও নুন লইয়া আমবাগানে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কণ্টকময় বঁইচি-বনে ঘুরিয়া সুপক্ক কালো বঁইচি-ফলের গুচ্ছ খুঁজিতে খুঁজিতে কুহুস্বরের প্রতিধ্বনি করিতছে। কোকিল বুঝি তাহাতে অপমানিত হইয়া নীরব হইতেছে। কেহ কোন রাখালের পাঁচনখানি চাহিয়া লইয়া গাছের উচ্চ শাখা হইতে কাঁচা আম পাড়িতেছে। বাগানের নিবিড়তর অংশে একটা

শৃগাল উপুড় হইয়া পড়িয়া ধুঁকিতেছে এবং কোনও দিকে সামান্য একটু শব্দ হইলেই মাথা তুলিয়া উদ্যতকর্ণে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। বাগান কেটে বসত হয়েছে। ঘিচিঘিচি মানুষের খুপরি খুপরি আস্তানা। নতুন শব্দ কানে ঢুকছে, 'প্রোমোটার'। যাঁরা অতীত গুঁড়িয়ে বর্তমান তৈরি করবেন। ফলে গ্রীষ্মের শোভা গেছে। সব অলঙ্কার অপহৃত। কষ্টটাই আছে ,রোমাঞ্চটা নেই। তবু জীবন যেখানে শুরু হয়েছিল দূর অতীতে, সেখানে খাড়ির জলের মতো অতীতে কোথাও কোথাও রয়ে গেছে। কারোর তেমন নজরে পড়েনি এখনো। ঘাপটি মেরে বসে আছে পলাতক অপরাধীর মতো। আমার অন্বেষণের শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নিশীথে' গল্পে লিখছেন, 'আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নিচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা শাদা মার্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুবির পানসির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।'

সেই বাগান আজও আছে। মনে হয় সেই বাগানই। একটু জীর্ণ হয়েছে। সমঝদার মানুষেরা সব চলে গেছেন এসেছেন ব্যবসাদারেরা। একাল সেকালকে ভাঙতে চায়। তবু আছে। হাতবদল হয়েছে। বিশাল গেট ঠেলে অনুমতি নিয়ে ঢোকা যায়। মোরাম বিছানো পথ। সেই বকুল। বাঁধানো বেদি। তাকিয়ে থাকি। রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে উঠে আসেন দক্ষিণাচরণবাবুর রুগ্‌ণা স্ত্রী। 'আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলার প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলুম। দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ।' হঠাৎ চেতনা আসে, দক্ষিণাচরণবাবুর মতো আমিও হ্যালুসিনেসানে আক্রান্ত। হয় তো কেউ শুয়ে আছে। শুয়ে আছে অসুস্থ বর্তমান। গ্রীষ্মের বাতাস পলিউসানে ভারি।

'ঘনসুগন্ধপূর্ণ' নয় ডিজেলগন্ধী। নীলআকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে কলের ধোঁয়া। চাঁদ ওঠে। রুপোলি আলোর বদলে পাই পিত্তবর্ণের আলো। এখন ভয় করে। এখন আর আনন্দে নয় বলি মহা আক্ষেপে, মরিয়া হয়ে কবি যা বলেছিলেন সাধকোচিত বীরত্বে, নাই রস নাই দারুণ দাহনবেলা/ খেলো খেলো তব নীরব ভৈরব খেলা/যদি ঝরে পড়ে পড়ুক পাতা/ ম্লান হয়ে যাক মালা গাঁথা/থাক জনহীন পথে পথে মরীচিকাজাল ফেলা//শুষ্ক ধূলায় খসে-পড়া ফুলদলে/ ঘূর্ণী-আঁচল উড়াও আকাশতলে/প্রাণ যদি কর মরুসম তবে তাই হোক— হে নির্মম/তুমি একা আর আমি একা কঠোর মিলনমেলা।।

রবীন্দ্রনাথ, গ্রীষ্মের বৈরাগ্য-মুগ্ধ ছিলেন। মৌনী তাপস, স্বয়ং রুদ্র হলেন গ্রীষ্ম। কি তার ব্যাপ্তি। কি তার তেজ। বিশ্বমন্দিরে বাঘছালের আসনে এসে বসেছেন দিব্যকান্তি সাধক। শ্বাস বইছে সুষুম্নায়। মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছেন কুম্ভকে ; তখন গাছের পাতা নড়ছে না, নৌকোর পাল ঝুলে পড়ছে। এই রুদ্রের কাছেই প্রার্থনা,

'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে/এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে/'

বিচিত্র এই যন্ত্রসভ্যতা। একদিকে বাড়িয়ে চলেছে উত্তাপ, অন্যদিকে তৈরি করেছে ঠাণ্ডিঘর। মানুষে আসছে নতুন বিভেদ। শীতল ঘরে বড় মানুষ। মানুষ, কিন্তু জাত আলাদা। আর খেটে খাওয়া ঘর্মাক্ত মানুষ। এক দল অসহিষ্ণু, অন্যদিকে সর্বংসহ। এই নিয়েই যত আন্দোলন, বিভেদ। ঠাণ্ডা আর ডাণ্ডা। উত্তাপই জীবন। শীতল ঘরের বন্দী মানুষ রেশম কীটের মতো বড় একা। নিজের ঐশ্বর্যের তন্তুতে আবদ্ধ। কোনো কবি তাদের কথা বলবেন না ; কারণ জীবন ওখানে জীবন্মৃত। বরং কবি বলবেন, 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের/ মটে মজুরের/ আমি কবি যত ইতরের/ আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের...

রবীন্দ্রনাথ জীবনে কর্ম আর ঘর্ম, দুটোকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। বোলপুরের প্রখর দারুণ অতি দগ্ধ দীপ্রদিনে তড়িৎব্যজনী ত্যাগ করে গরমটাকেই উপভোগ করতেন। 'তপ্ত বোশেখে আকাশে বসে কে আগুন ফোয়ারা হানে ?' রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করে থাকতেন- কখন আসবে কাঙ্খিত কালবৈশাখী। সৃষ্টির একপাশে বসে দেখতেন ধূসরপাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় উর্ধ্বমুখে/ছুটে চলে চাষি/ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে

ত্রস্ত তরী যত/তীরপ্রান্তে আসি'....গ্রীষ্মকে চিনতে হলে রিক্ত হতে হবে। বিরক্ত হলে চলবে না।

সহ্যের নাম গ্রীষ্ম। এই শহর জীবনে গ্রীষ্মকে মনে হতে পারে মৌনী তাপস নয় দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক। কেবলই চাবকাচ্ছে; কারণ সভ্যতার সঙ্গে গ্রীষ্মের অহিনকুল সম্পর্ক। গাছ নেই শুধু রাজপথে। বিশাল বিশাল বাড়ি। ধাতুর চাদর মোড়া শম্বুকগতি যানবাহন। ঠাসা মানুষ। টেরিলিন টেরিকট্‌ন। ধুলো-ধোঁয়া। দম বুঝি বন্ধ হয়ে আসে। এ হলো মানুষের কেরামতি। নিজেদের কলে পড়ে নিজেরাই মৃতপ্রায়। শিল্প শহরে গ্রীষ্ম যেন নিপীড়ক। লোহার খাঁচা, ইটের স্তূপ, ব্লাস্ট ফার্নেসের আগুন, সিমেন্ট কারখানা, উত্তাপে বালি গলে কাচ হচ্ছে, লোহার গাড়ি লোহার লাইন ধরে ছুটছে। টেলিগ্রাফের তারে হতবাক শ্যামাপাখি। আমাদের চুল ধুলোয় পিঙ্গল বর্ণ। পিঠের জামা ঘামে ভেজা। মুখ পুড়ে বাদামী। দু'চোখে জ্বালা। কারো কারোর মাথায় ছাতার ব্যর্থতা। এরই মাঝে সিগারেটে দমভর টান। মোগলাই খানাঘরে প্রভূত মশলা সহযোগে রামপাখির ঠ্যাং ধরে টানাটানি। বোতলের বুড়বুড়ি কাটা নরম পানীয়। প্রেক্ষাগৃহে বসে বসে দরবিগলিত ঘাম, পর্দায় বরফপ্রান্তরে নায়িকার নৃত্য। ময়দানের অন্ধকারে বাতাসভুক মানব-মানবী। পেছনে অন্ধকারে নিমজ্জিত খাসা শহর। কোলাঘাটে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ডিগবাজি। শেষ ট্রাম ধরে দমবন্ধ গলির, আটকাঠ বন্ধ আস্তানায় ফিরে আসা। একই ঘরে কয়েকজনের ঠাসাঠাসি। শুকনো কল। ঝাঁঝালো বাথরুম। এরই মধ্যে ক্যাসেটে বেগম আখতার, কোয়েলিয়া গান থামা এবার। উদ্দাম হরিনাম সংকীর্তন। ভাড়াটে-বাড়িঅলার খণ্ডযুদ্ধ। কাংস চিৎকার। ছাপাখানার ধড়াস ধড়াস শব্দ। গ্রিলকারখানায় লোহাপেটাই। মাতালের মধ্যরাতের গান, 'সুরা পান করিনে আমি, সুধা খাই মা তারা বলে/ আমার মনমাতালে মেতেছে আজ/ যত মদ-মাতালে মাতাল বলে!'

ছড়াস্ করে একটা শব্দ অতীত থেকে উঠে ক্রমে কানে বাজে। কলকাতার রাস্তা তখন জল দিয়ে ধোয়া হত। আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে হেদোর উল্টো দিকে দাঁড়াতুম, আর তখনই কাণ্ডটা ঘটত। হোসপাইপের জল দিগ্বিদিক প্লাবিত। মাঝে মধ্যে আমরাও স্নাত হতাম। উত্তপ্ত রাস্তা জলে ভেজার সঙ্গে সঙ্গে শৈত্যের গন্ধ ছাড়ত। ভিজে রাস্তার মাথার ওপর শহরের আকাশ হয়ে উঠত মন কেমন করা

নীল। কোথা থেকে বেরিয়ে আসত রঙ-বেরঙের ফেরিঅলার দল। কেউ হাঁকছে বেলফুল, কেউ হাঁকছে মালাই, গোলাপি রেউড়ি, হরিদাসের বুলবুল ভাজার ঘুঙুর পায়ে নাচ। বিখ্যাত শরবতের দোকানে লম্বা লাইন। ভ্যানিলা, আইসক্রিম, আমপোড়া, ডাবের শরবত। দেখতে দেখতে মুচমুচে পাঁপড় ভাজার মতো একটা দিন রাতের কোলে নেতিয়ে পড়ত। ফটফটে তারা ভাঙা চাঁদ। দূরাগত সানাই। গ্রীষ্মের বিবাহ। রজনীগন্ধার মালার তারিণী সুবাস। শোলার টোপরে অভ্রের কুঁচি। গ্রীষ্ম আর বর্ষা—এই তো আমাদের ঋতু। মুখচোরা শীত, ফিনকি বসন্ত ধর্তব্যেই আসে না। গ্রীষ্ম এক উদার প্রান্তর। দয়া, মায়া, সাধনা, নিষ্ঠুরতা মেশানো প্রখর এক ব্যক্তিত্ব। কত কাজ, কত কর্তব্য তাঁর। শীতে জরায় রিক্ত পত্র বৃক্ষশাখে সাজাতে হয় নবীন উদ্ভেদ। ফোটাতে হয় পদ্ম। সারাদিন জলকে বাষ্প করে চরাতে হয় মেঘের পাল। বাতাসকে উত্তপ্ত করে পৃথিবীর বুকে রচনা করতে হয় শূন্যতা, ছোটাতে হয় দামাল কালবৈশাখী। দখিনের জানালা খুলে বহাতে হয় দখিনা বাতাস। দর্দম নিশ্চিত, নূতন নিষ্ঠুর নূতন। এ সবই তাঁর বিশেষণ।

'হে দুর্দম, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে।'

ধর্মের আলো

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর চারের দশক পর্যন্ত যে সময়, সেই সময়কালে আমরা আমাদের আদর্শের অভ্যুত্থান দেখেছি। মানুষ দেখেছি, বড় বড় মানুষ। দেখেছি চিন্তাবিদ। কালটিকে জাগরণের কাল বলতে পারি। মহাপ্রভু সংক্ষিপ্ত জীবনে যে আলোড়ন তুলে গিয়েছিলেন, সেটি মন্থর হতে হতে একটি ধর্ম, একটি বিশেষ গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। চর্চার চেয়ে আচার, মুক্তির চেয়ে সংস্কার, স্বাধীনতার চেয়ে প্রথাই বড় হল, যেমনটি হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে। আশ্রম-ভিত্তিক গুরুবাদ, আমার ধর্মই একমাত্র ধর্ম—এইরকম একটা সঙ্কীর্ণতা আচরিত হত! শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবে ঘোরতর লাঠালাঠি। ধর্ম রইল, মানুষ পড়ল ঘুমিয়ে।

ইসলাম সংস্কৃতি, শাসন ও ধর্ম হিন্দুধর্মকে গ্রাস করতে পারেনি। যেমন বুদ্ধদেবের নিরীশ্বরবাদ, জগৎ-পলায়নী মন্ত্র ধাক্কা খেল শংকরের অদ্বৈত বেদান্তে। স্বতন্ত্র একটা ধর্ম হতে গিয়েও বেদান্তে নিমজ্জিত হয়ে স্বাতন্ত্র্য হারাতে বাধ্য হল। শুধু তাই নয়, শঙ্কর শূন্যবাদ, মায়াবাদকে, নিরাকার ব্রহ্মকে স্বীকার করেও সাকারকে মেনে নিলেন আমজনতার সাধন সুবিধার জন্যে। এমন কি গুরুবাদকে ধর্মে স্থান দিলেন।

"শরীরং সুরূপং তথা বা কলত্রং,
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥"

জীবের অন্তঃস্তলে সরাসরি আঘাত। বুঝে নাও নিত্য ও অনিত্যের পার্থক্য। ভূমি ও ভুমার পার্থক্য। প্রথম দুটি ছত্রে বৌদ্ধ দর্শন, সুরূপ দেহ, তদনুরূপ রূপবতী ভার্যা, তোমার নির্মল অদ্ভুত যশ, মেরুতুল্য ধন, তোমার সবই আছে, কিন্তু বৎস! এ সবই তো অনিত্য। এই সব আছে, থাক, তুমি গুরুর কাছে যাও। 'গু' হল ধর্ম, গূহ্যতত্ত্ব,

'রু', যিনি দান করেন। ধর্ম যিনি দান করেন তিনিই গুরু। সেই গুরুদেবের চরণকমলে চিত্ত সংলগ্নই যদি না হয়, তবে ওইসবে কি ফল, কি ফল, কি ফল?

শংকর নির্গুণ নিরাকার, সাধারণের দুরধিগম্য ব্রহ্ম ধারণার পাশাপাশি

সগুণ সাকারকে প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মের সাধারণী করলেন। এক ধরনের 'প্রোলেটারাইজেসান'। এমন কি গোবিন্দ বন্দনাও করলেন, জ্ঞানের পাশে ভক্তির প্রতিষ্ঠা :

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভম্।
গোবর্দ্ধনধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্॥

গীতায় শ্রীভগবান পথ দেখালেন,—কর্মের পথ ধরে ভক্তিতে, ভক্তি খুলে দেবে জ্ঞানের সিংহদুয়ার। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও জননী সারদা এই ত্রয়ী এই 'ট্রিনিটি' আসবেন বেশ কিছু পরে। তার আগে আসবেন মহাপ্রভু। ভারতভূমের আদি সোস্যালিস্ট। ধর্মের কারামুক্তি ঘটবে। জাতপাতের কুসংস্কার ঘুচে যাবে। তিনিই বলবেন ভক্তের আবার জাত কী। ভক্তের জাত ভক্ত। হরিভক্ত হলে চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বহু পরে এসে এটিকে 'আন্ডার লাইন' করবেন। তৎশিষ্য নরেন্দ্রনাথ মহাপ্রভুকে এই ভাবে দেখবেন, "একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক' জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল, কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্মজীবনের সহভাগী হইয়াছিল!"

'কিছু দিনের জন্য', আবার ঘোলাটে হতে সময় লাগেনি অধিক; কারণ অর্থনীতির মতো ধর্মও শোষণের হাতিয়ার। সতীকে দাহ করলে সম্পত্তি যদি হাতে আসে, তাহলে পতির চিতায় সতীকে তোলা অক্ষয় পুণ্যের কাজ। প্রত্যেকেই যদি প্রথম সন্তানটিকে জলে বিসর্জন দেন তাহলে লোকসখ্যার বৃদ্ধি আয়ত্তে থাকতে পারে। ধর্মকে ঈশ্বর লাভের উপায় না ভেবে ভয়ের আকারে জনসমাজে উপস্থিত করতে পারলে ধর্ম ব্যবসায়ীরা অবশ্যই লাভবান হবেন। মন্দির ও অর্জিত সম্পত্তির ওপর ধর্মগুরুর ভোগরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। শাসকগোষ্ঠী ধর্মকে বিভেদ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করবেন। মতুয়ার বুদ্ধি বলবে, আমার ধর্মই ধর্ম। ইংরেজ শাসক কায়দা বের করবেন—divide and rule। আমাদের

স্বাধীনতায় কর্তিত হবে দেশ। চির-বৈরিতার পথ প্রশস্ত হবে। তৃতীয় বিশ্বের এই বৃহৎ ভুখণ্ডটি চিরকাল অনগ্রসর থাকবে। শ্রেষ্ঠ মনীষার অস্ত, গুণ্ডারাজের উদয়। ধর্মের সঙ্গে কর্ম যুক্ত হবে না কোনোদিন। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হবে পলায়নী বৈরাগ্য! ধর্ম হবে গুহাশায়িত। দ্বিতীয় কোনো অশোকের অথবা উদার কোনো ইসলাম আকবরের অভ্যুত্থান হবে না!

আমাদের পরাধীনতার সঙ্গে আমাদের ধর্মের প্রবল যোগ। ধর্ম দুর্গের মতো কাজ করেছে নিঃসন্দেহে। পরাধীনতায় অর্থনৈতিক অধীনতা সমাজের ক্ষতি করলেও ভারতের অসংখ্য মানুষের নৈতিকতা, স্বাজাত্যভিমান, দেশাত্মবোধ অনেক উগ্র হয়েছিল, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি এই আবেগ তখন ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত হত না। প্রভুদের কোনো জাত নেই। বিদেশি প্রভুদের আমলে আমরা রামমোহন, দয়ানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি প্রমুখ জ্যোতিষ্ককে পেয়েছি। দেশি প্রভুদের পঞ্চাশ বছরের নর্তনকুর্দনে চারপাশ থই থই কয়ছে বড় বড় চোরে। পঞ্চাশ বছরের কৃতিত্ব, আন্তর্জাতিক সমীক্ষার খেতাব—পৃথিবীর পুরোধা দুর্নীতিপরায়ণ দেশগুলির অন্যতম এই ভারত। সেই অর্থে ভারত একটি রত্ন। ইংরেজরা ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন কেক কাটা ছুরির মতো। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মডেল তৈরি করেছিলেন, মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন, এই উত্তরণের চিত্রে ইষ্ট ঈশ্বরের আসনে স্বদেশ-জননীকে স্থাপন করে, প্রাণ প্লাবনে যে নতুন তরঙ্গ তুলেছিলেন তার সঙ্গে আইরিশ চিন্তাধারার যোগাযোগ, সাযুজ্য খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না। জননী, জন্মভূমিশ্চ স্বর্গদপি...। শ্রীঅরবিন্দে এই ভাবেরই কর্মসমপ্রসার। ধর্ম আর প্রেমে বস্তুগত পার্থক্য, ভাবগত পার্থক্য নেই। সেটি ভক্তমালের বিল্বমঙ্গল উপাখ্যানে উপস্থাপিত। শ্রীঅরবিন্দ আইরিশ 'লোটাস অ্যান্ড ভ্যাগার' আন্দোলনের ভাবগ্রহণ করে মানিকতলার বোমা দিয়ে দেশমাতার শৃঙ্খলমোচন করতে চেয়েছিলেন। সমকালের সাহিত্যে শরৎচন্দ্র একে করলেন 'পথের দাবী।' মুকুন্দ দাস ও ভারতচন্দ্র ছন্দোবদ্ধ ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, রঙ্গলাল নবীনচন্দ্র বারে বারে ধাক্কা মারলেন, স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়। নজরুল বের করলেন তরোয়াল। এ সবই আধ্যাত্মিকতা। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রিত সন্ত্রাসবাদ, তদ্‌উদ্ভূত,

যুগান্তর, অনুশীলন, বাঘাযতীন, বিনয়, বাদল, দিনেশ, করিডর যুদ্ধ, গোটাকতক ইংরেজ হত্যা, আগে কে বা প্রাণ করিবেক দানের পেছনে উদ্দীপনা একটাই—'বন্দেমাতরম'। এর থেকে যে সর্বনাশটি হয়েছে, সেটির সঙ্গে তুলনীয়, বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম এবং তন্ত্রের অধঃপতন।

স্বামীজির এই ভয়ংকর উক্তিটি অনুধাবন করলে, স্বাধীনতার জন্যে সন্ত্রাসবাদী দলগুলির সশস্ত্র অভ্যুত্থান,বিশ্বপটে নেতাজির অগ্নিরেখা ও বর্তমানের 'পার্লামেন্ট' একটি যোগসূত্র স্পষ্ট হবে। স্বামীজি বলছেন, ক্রমশঃ রূপ-সনাতন ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আসন বাবাজীগণ অধিকার করিলেন! তাহাতে শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায় ক্রমশ ধ্বংসাভিমুখে যাইতেছিল....' বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও স্বামীজির বক্তব্য অতিস্পষ্ট। রাজাশ্রয়ী বৌদ্ধধর্ম বিকশিত হয়েছিল, কারণ, 'এ যুগের শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী যর্জুযাজী পুরোহিতে নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীপতিতে সমাহিত নহে; এ যুগের দিগদিগন্তব্যাপী অপ্রতিহত শাসন আসমুদ্রক্ষিতীশগণই মানব শক্তিকেন্দ্র। এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক প্রভৃতি। বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাট্‌গণের ন্যায় ভারতের গৌরব-বৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কখন ভারত সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই।'

পরিণতি কী হল! এই কালে যা হয়েছে। স্বামীজির অনুধাবনে, 'এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান। ইঁহাদের হস্তে ভারতের রাজদণ্ড পুনর্বার অখণ্ড প্রতাপ হইতে বিচ্যুত হইয়া শতখণ্ড হইয়া যায়। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজশক্তির সহিত সহকারি ভাবে উদ্‌যুক্ত হইয়াছিল।' সাতচল্লিশ থেকে সাতানব্বই, ভারত-রাজনীতির ক্রমপরিণতি বিদায় বিদেশি-সিংহাসনে আসনি নেহরু—আসমুদ্র হিমাচল দোর্দণ্ড প্রতাপ কংগ্রেস—নেহরুর অবসান—ইন্দিরার-রাজীব-নরসিংহ-গুজরাল-সীতারাম-লালু-মুলায়ম-চন্দ্রবাবু-জ্যোতি-সন্ত্রাস কংগ্রেসের নাভিশ্বাস-এবং!

আবার ফিরে আসি স্বামী বিবেকানন্দে। স্বামীজি লিখেছেন, "যে পুরোহিতশক্তির সহিত রাজশক্তির সংগ্রাম বৈদিক কাল হইতেই চলিতেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমানব প্রতিভা স্বীয় জীবদ্দশায় যাহার ক্ষত্রপ্রতিবাদিতা প্রায় ভঞ্জন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ্যশক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপপ্লাবনে ভারতের কর্মক্ষেত্র হইতে প্রায় অপসৃত হইয়াছিল,

অথবা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেছিল, যাহা মিহিরকুলাদির [হূণ জাতীয় রাজা] ভারতাধিকার হইতে কিছুকাল প্রাণপণে পূর্বপ্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ওই প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মধ্য এশিয়া হইতে সমাগত ক্রূরকর্মা বর্বরবাহিনীর পদানত হইয়া, তাহাদের বীভৎস রাজনীতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া, বিদ্যাবিহীন বর্বর ভুলাইবার সোজা পথ মন্ত্র-তন্ত্রে-মাত্র-আশ্রয় হইয়া, এবং তজ্জন্য নিজে সর্বতোভাবে হতবিদ্য, হতবীর্য, হতাচার হইয়া আর্যাবর্তকে একটি প্রকাণ্ড বাম-বীভৎস ও বর্বরাচারের আবর্তে পরিণত করিয়াছিল এবং যাহা কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারহীন ও অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পশ্চিম হইতে সমুত্থিত মুসলমান আক্রমণ রূপে প্রবল বায়ুর স্পর্শমাত্রেই তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল।' পুনর্বার কখনও উঠিবে কি, কে জানে ?"

শ্রীঅরবিন্দ সন্ত্রাস ছেড়ে চলে গেলেন মননের পথে। তিনি বুঝেছিলেন আরোহণই শেষ কথা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রতিধ্বনি, মানুষ নয় মানহুঁস চাই। তাঁর শেষ আশীর্বাদ, তোমাদের চৈতন্য হোক নয়, তোমরা চৈতন্য হও। এটি আবার শঙ্করাচার্যেরই সহজ রূপ, শঙ্কর বলছেন, তিনটি জিনিস এই ভূমণ্ডলে দুর্লভ,—প্রথম হল মনুষ্য। জন্ম আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি, পশু নয়, এ আমার ভাগ্য। কিন্তু মানুষ হয়ে জন্মাবার পর আমি যদি মুমুক্ষু হতে চাই, জীবনমুক্তি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হই, তাহলে সেটি হবে ভাগ্যেরও ভাগ্য। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলছেন, মর্ত সীমা চূর্ণিতে চাই। 'মানুচ চুর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা।' শঙ্কর বলছেন।

দুলর্ভং ত্রয়মেবৈতৎ দৈবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥

মুমুক্ষাই মানুষকে উচ্চভাব গ্রহণে আগ্রহী করবে।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই শতকের স্বাধীনতার প্রাক্কাল পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের সমান্তরালে ভাবান্দোলন প্রবল হয়েছিল। হিন্দুধর্ম থেকে ব্রাত্যজনেরা ইসলাম হয়েছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে। কিন্তু মিশনারিরা যে ধর্মাধীনতা আমাদের ওপর চাপাতে চেয়েছিল, তা আরো সাংঘাতিক। ভোগবাদে মানুষকে জর্জরিত করে যন্ত্রে পরিণত করা। ইন্দ্রিয়পরতা। শিক্ষিত, ভোগবাদী, হেয়ার, হিন্দুর

ছেলেদের 'ইট, ড্রিংক, বি মেরি অ্যান্ড ডাই'-এর সাংঘাতিক প্রলোভন থেকে বাঁচাবার জন্যে এল ব্রাহ্মধর্ম। সেটিও যথেষ্ট নয়।

তখন দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির কালীবাড়ি থেকে প্রসারিত হল প্রবাহ, যার সার কথা—যত মত তত পথ। যার সার কথা, ঈশ্বর নয়। মানুষ। জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা। যার সার কথা, আত্মনোমোক্ষোর্থং জগদ্ধিতায় চ। মুক্তোহপি। যেখান থেকে উৎসারিত হল ধর্মের শেষ কথা, পাপ বলে কিছু নেই, ভক্তের কোনো জাত নেই, পেট বৈরাগী, মান ভিখারি, বহির্সন্ন্যাসের কোনো দাম নেই। অন্তর্সন্ন্যাসই সন্ন্যাস। খালি পেটে ধর্ম হয় না। আগে অন্ন, পরে ধর্ম। মানুষই শেষ কথা। শিবরূপী জীবের আরাধনা। ঈশোপনিষদের সেই প্রথম সূক্তটি—চ ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম।

এই উৎস থেকেই প্রকাশিত হলেন নরেন্দ্রনাথ, পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ। যিনি বললেন, বিবেকের জাগরণই ধর্ম। বিচারই পথ। আত্মবিচার। আমার মানুষ হতে আর কতটা বাকি আছে—a sensible man, a reasonable man, a loving and lovable man, 'মানুষ চাই মানুষ,.....'

গুরুর মন্ত্রে, আদর্শে, ভাবে মেশালেন নিজের মনস্বিতার আগুন। হিরোসিমায় বিস্ফোরিত হয়েছিল জড় বিজ্ঞানীর বিধ্বংসী আণবিক মারণাস্ত্র, তার অনেক আগেই এখানে বিস্ফোরিত হল চৈতন্যের আণবিক বোমা, অল নিগেসান (Negation) ইজ ডেথ। নেই নেই করতে করতে সাপের বিষও নেই হয়ে যায়, পালাবে কোথায়!

পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল,
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।

এক হাতে গীতা, আর এক হাতে স্বামীজির বাণী, স্বদেশি যুবকের দল ছুটছে, আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান। মহাত্মাজি রাসকিনের 'আনটু দিস লাস্ট'-এর মডেলে যে ভারত গড়তে চেয়েছিলেন সেও এই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মডেল। মানুষকে স্বরাট ও বিরাট করার স্বপ্ন—

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?

অন্ত্যেবাসী মানুষের নিজস্ব জাগরণ চাই। একালের প্রভুর গদির স্বার্থে তীর ধনুকের আন্দোলন নয়, গদা দিয়ে একটা মসজিদ ভেঙে শঙ্খচক্রগদাপদ্মের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার 'মতুয়া-ধর্ম' নয়। অন্ন, স্বাধিকার, আত্মিক জাগরণই ধর্ম। 'তোরা কাজ করতে করতে মরে যা'—মঠের সন্ন্যাসীদের উজ্জীবিত করছেন স্বামীজি। 'নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।'

একালের চটকদারি স্লোগান, 'গো গ্লোবালের' ভারত নয়, হাওলা, গাওলা, তিহার জেলবাসী গুরু, প্রোমোটারের ভারত নয়, শৌখিন মজদুরির ভারত নয়। দীর্ঘ এক প্রবন্ধের ভূমিকামাত্র এই লেখাটি শেষ করব স্বামীজির এই কথাটি (যা অতিশয় প্রাসঙ্গিক) দিয়ে : 'আলো—আলো নিয়ে এসো। প্রত্যেকের কাছে জ্ঞানের আলো নিয়ে এসো, যতদিন না সকলেই ভগবান লাভ করে, ততদিন তোমাদের কাজ শেষ হবে না। দরিদ্রের কাছে আলো নিয়ে চলো, ধনীর কাছে নিয়ে এসো আরও অধিক আলো—কারণ দরিদ্রের চেয়ে তার আলোর প্রয়োজন বেশী।'

মৎসংযোজন—পার্লামেন্টে আলো, অ্যাসেম্বলিতে আলো, মান্টিস্টোরিডে আলো, গদিতে, গদিতে অলো...।

চীনে গল্প

একটি চৈনিক গল্প মনে পড়ছে। ভারতবর্ষের এই মনোরম প্রেক্ষিতে গল্পটি মনে হয় শোভন হবে। লোককাহিনীর এই গুণ, মানুষের সব কালেই প্রাসঙ্গিক। তার অর্থ, মানুষের সব কালই এক কাল। কালে, কালে সেই একই মানুষের লীলা খেলা।

মিং রাজত্বকালে শানডং প্রদেশে এক ধনী ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁর একটি ছেলে ছিল। বাপ মায়ের অতি আদরে ছেলেটি বখে গিয়েছিল। লেখাপড়া কিছুই শিখল না। খায় দায় আর আড্ডা, ইয়ার্কি মেরে বেড়ায়। প্রতিদিনই সে পান ভোজন শেষ করে শহরের পথে চরতে বেরোয়। তার হাতে থাকে সুদৃশ্য একটি খাঁচা, আর সেই খাঁচায় একটি পাখি। তাকে তার আসল নামে আর কেউ ডাকে না। সবাই বলে, 'পাখি'।

একদিন শহরের রাজপথ ধরে সে চলেছে। নিষ্কর্মা, মূর্খ, সেই ধনীর সন্তান। পথের এক পাশে বসেছে এক জ্যোতিষী। রোজ যেমন বসে। দু' দশ টাকার বিনিময়ে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেয়। যথারীতি তাকে ঘিরে মানুষের জটলা।। 'পাখি' ভাবলে, যাই দেখি, মজাটা কেমন জমেছে। ভিড় ঠেলে সামনে দাঁড়াতেই গণকঠাকুর চিনে ফেলেছে। আরে এই তো সেই বড়লোকের বেটা! সঙ্গে সঙ্গে গণক একটা মতলব ভেঁজে ফেললে— পাঁঠাটাকে আচ্ছাসে তোয়াজ করে কিছু পয়সা হাতিয়ে নেওয়া যাক। পাখিকে ডেকে গণক বলছে, 'আরে, এসো, এসো ভাই। এতদিন ছিলে কোথায়! তোমার কথা আমি যে রোজই ভাবি, যার এমন সুন্দর ধারাল দুটো চোখ, ধনুকের মতো দুটো মোটা ভুরু, তুমি তো ভাই রাজনীতিতে গেলে মারমার, কাটকাট করে ফেলবে। কোথায় যে উঠে যাবে, তুমি নিজেই জান না। কোনোদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কপালটা দেখেছ ভাই! অত চওড়া উঁচু কপাল কজনের হয়! এ তো রাজার কপাল! তুমি যদি বেজিং-এ গিয়ে রাজ দরবারের পরীক্ষায় বসতে, তাহলে আমার বিচারে তুমি

ফার্স্ট হতে। আর সরকারের সব চেয়ে উঁচু পদটি হত তোমার। নিজের ভাগ্য নিজেই জান না ভাই, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ অকাজে। তোমাকে আমি আমার আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি, তখন তো এই অধমকে আর মনে রাখবে না!'

'পাখি' যদি গোমূর্খ না হত, লোকটির এই চাটুকারিতার জবাব দিত, দু'গালে ঠাস ঠাস করে গোটাকতক চড় মেরে। যে পড়তে জানে না, একটা অক্ষরও লিখতে পারে না, সে বসবে রাজ দরবারের পরীক্ষায়। শুধু বসবে না, সসম্মানে পাস করে সর্বোচ্চ রাজপদ পাবে! পাখি এসব না ভেবে ভাবলে যা, তা হল, বলা তো যায় না, কি থেকে কি হয়! আমার বাপের অনেক পয়সা! সেই অঢেল পয়সার ঠেলায় রাজপদে গিয়ে বসা এমনকি কঠিন ব্যাপার! পাখি মনে মনে ভীষণ খুশি হয়ে বাড়ি চলে এল। আসার আগে জ্যোতিষীকে ভাল করে জিজ্ঞেস করে এল, 'তুমি কি নিশ্চিত যে, আমার দ্বারা পরীক্ষা পাস সম্ভব?'

—শুধু নিশ্চিত নই, প্রথম তিন জনের মধ্যে তোমার নাম থাকবেই থাকবে।'

—এখন তোমাকে আমি দুশো টাকা দিচ্ছি। যদি তোমার ভবিষ্যদ্বাণী মেলে, তাহলে আরো পাবে, আর যদি না মেলে ঠাকুর, তাহলে সুদে আসলে তোমার সব কটা দাঁত উপড়ে নেবো।

জ্যোতিষী মনে মনে ভাবলেন, যবে তুমি রাজা হবে, তখন আমি চিতায়, কার দাঁত ওপড়াবি রে পাঁঠা!

পাখি লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরে এল। ব্যাগ গোছানো হয়ে গেল। টাকা-পয়সা ভরে নিল গেঁজেতে। পাখি চলেছে কোথায়? বেজিং-এ উচ্চ রাজপদের নির্বাচনী পরীক্ষায় বসবে। একবারও মাথায় এল না, তার মতো 'ক অক্ষর গোমাংস' এক মহামূর্খ করে পরীক্ষায় বসতে পারে!

বেজিং-এ পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল। আবার সেই দিনই পরীক্ষার শেষ দিন। রাজধানীতে প্রবেশের পশ্চিম সিংহদুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। পাখি কিছুই জানে না। সে দেখলে সার সার জলের গাড়ি চলেছে। মিং আর কিং ডাইনাস্টির রাজারা প্রস্রবণের জল পান করতেন স্বাস্থ্যের কারণে। দূরে একটা পাহাড় ছিল, সেই পাহাড়ে ছিল জেড স্প্রিং। জল আসছে সেইখান থেকে। পাখি আসছিল ঘোড়ায়

চেপে। জলের গাড়ির পেছন পেছন সে শহরে ঢুকে পড়ল। প্রহরীরা বাধা দিলে না, ভাবলে রাজপ্রাসাদের প্রহরী, জলের গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

শহরে তো ঢুকল, কিন্তু কিছুই জানে না, কোথায় কী আছে। পরীক্ষাকেন্দ্র কোথায়, কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরে বেড়াল। বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়ল শহরের চৌমাথায়। সেখানে এসে দেখছে লণ্ঠন হাতে এক দল লোক আসছে। তাদের মাঝখানে রয়েছেন স্বয়ং রাজকুমার। তারা বেরিয়েছে শহরে রাতের চৌকি দিতে। এত লোককে এক সঙ্গে আসতে দেখে পাখির ঘোড়া ক্ষেপে গেল। লাগাম টেনেও বাগে রাখা গেল না। পাখির ঘোড়া গিয়ে পড়ল রাজকুমারের ঘোড়ার ঘাড়ে।

এই রাজকুমার রাজার অতিশয় প্রিয়, ফলে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং বদমেজাজি। ইচ্ছে করলে তখনই তরোয়ালের এক কোপে পাখিকে খতম করে দিতে পারত। কিন্তু রাজকুমারের কৌতূহল জাগল—মারার আগে জানা দরকার—এই উজবুকটা কে!

রাজকুমার তার নিজের ঘোড়ার রাশ সংযত করে প্রশ্ন করল।

—এই যে ছোকরা বেঁচে থাকায় বিরক্তি ধরে গেছে বুঝি?

পাখি তো কিছুই জানে না কোন দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে কথা বলছে। ধড়, মুণ্ড আলাদা হল বলে। পাখি চিৎকার করে উত্তর দিলে— আমার সঙ্গে ওইভাবে কথা বলবে না। সাবধান করে দিচ্ছি। জান না, আমি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি।

—কি কাজ মানিক?

—আমি সেই শানডং থেকে সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছি। আমাকে রাজদরবারের পরীক্ষায় বসতে হবে। যদি আমার দেরি হয়ে যায়, তাহলে প্রথম তিনজনের মধ্যে আমার নাম থাকবে না।

—প্রথম তিনজনের মধ্যেই যে তোমার নাম থাকবে, তুমি এতটাই নিশ্চিত?

—তা না হলে অতদূর থেকে আমি পরীক্ষা দিতে ছুটে আসবে কেন?

—সে তো বুঝলাম, কিন্তু পরীক্ষার হলের দরজা তো এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে, তুমি ঢুকবে কী করে?

—আমি গিয়ে দরজায় টোকা মারব।

রাজকুমার মনে মনে ভাবলে, বেটা ভাঁওতা মারছে, প্রথম

তিনজনের একজন হবে, এতই পণ্ডিত তুমি! বেশ একটা চান্স দেওয়া যাক। ধাপ্পা ধরা পড়লে কচুকাটা করতে কতক্ষণ। রাজকুমার তখন তার পার্ষদদের হুকুম করলে— এই, আমার একটা পরিচয়পত্র একে দিয়ে দে, যাতে বিনা বাধায় পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারে। তোদের একজন গাইড হয়ে এই ছোকরার সঙ্গে যা।

পাখি তো মহা খুশি। গাইড আগে আগে, পাখি তার পরিচয়পত্র দোলাতে দোলাতে পিছে পিছে পিছে। টোকা মারতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন দুই প্রধান শিক্ষক। পরিচয় পত্র দেখে দুই প্রধান শিক্ষকের একজন লাফিয়ে উঠলেন— ওরেব্বাবা এতো খোদ রাজকুমারের পরিচয়পত্র। নিশ্চয় তাঁর কোনো আত্মীয়। একে তো ঢুকতে দিতে হবেই। দ্বিতীয় পরীক্ষক বললেন, তা কী করে হয়, আমার কোনো ঘরেই তো কোনো জায়গা নেই। শলাপরামর্শে অবশেষে ঠিক হল, প্রধান পরীক্ষক দু'জন তাঁদের ঘরটি পাখিকে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে রাত কাটাবেন। রাজকুমারের আত্মীয়কে কী ফেরান যায়, তাহলে ধড়ে মুণ্ড থাকবে না।

পাখি ঠাঁই পেল। প্রথম পরীক্ষক বললেন, তাহলে ওকে কাগজ আর প্রশ্ন দেওয়া যাক। দ্বিতীয় পরীক্ষক বললেন, দাঁড়াও, কোন বিষয়ের প্রশ্ন দেবে? ওর বিষয়টাই তো জানা হল না।

জিজ্ঞেস করার সাহস হল না দু'জনেরই। রাজকুমারের আত্মীয়। বিষয়টা তো তাঁদের আগে জানা উচিত ছিল। তখন দুজনে ঠিক করলেন, তাঁরাই সব উত্তর লিখে চিফ-এর কাছে খাতা জমা দেবেন। তাই হল। পাখি পড়ে পড়ে ঘুমলো, এদিকে তার খাতা জমা পড়ে গেল। পরীক্ষকরা তাকে প্রথমই করতেন। চক্ষুলজ্জার কারণে তাঁরা পাখিকে দ্বিতীয় স্থান দিলেন।

প্রথা অনুসারে ফল প্রকাশের দ্বিতীয় দিনে উত্তীর্ণরা সবাই পরীক্ষকদের সম্মান জানতে গেল। সে দলে কিন্তু পাখি নেই। কারণ এসব ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পরীক্ষকরা অবাক হয়ে নিজেরাই পাখির কাছে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। পাখি বোকার মতো যা হয় একটা উত্তর দিয়ে গুম মেরে বসে রইল। পরীক্ষকরা অবশ্য এর বেশি আর কিছু করার সাহস পেলেন না। তাঁরা ভাবলেন, এ হল রাজকুমারের বন্ধু। অথবা কাছের আত্মীয়। শীঘ্রই উঁচু রাজপদে গিয়ে বসবে, তখন একেই তো আমাদের তেল মেরে চলতে হবে।

ইতিমধ্যে পাখি জানতে পেরেছে, যার পরিচয়পত্রের জোরে এতসব কাণ্ড হয়েছে সে হল এই রাজ্যের ক্ষমতাশালী রাজকুমার। পাখির আর কিছু না থাক কুচুটে বুদ্ধির অভাব ছিল না। দামী দামী উপহার সামগ্রী নিয়ে সে রাজকুমারের বাড়িতে গিয়ে হাজির। পাখি প্রহরীর হাতে তার নামে কার্ড আর উপহারের একটা তালিকা ভেতরে পাঠিয়ে দিল। রাজকুমার মানুষটাকে ভুলে গেলেও উপহারের তালিকা দেখে বেজায় খুশি। প্রহরীকে বললেন, এক্ষুণি ভেতরে নিয়ে আয়। পাখি বললেন, সেদিন আপনি পরিচয়পত্র দিয়ে পরীক্ষায় বসতে সাহায্য না করলে আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে পারতুম না। রাজকুমার ভাবলেন, বাবা, এ তো সত্যিই মহাপণ্ডিত, তাই সেদিন অত বোলচাল মেরেছিল। আমি যখন সম্রাট হব, তখন তো একে আমার কাজে লাগবে। এর অনারে এক্ষুণি একটা মহাভোজের আয়োজন করো।

সাংঘাতিক পান-ভোজনের পর পাখি বিদায় নিল। বিদায় জানাতে স্বয়ং রাজকুমার রজা পর্যন্ত এলো। যা অন্য কারো বেলায় সচরাচর করে না। সারা বেজিং-এ এই সংবাদ ছড়িয়ে গেল। পাখির জয়জয়কার। রাজকর্মচারীরা এইবার একযোগে সম্রাটের কাছে একটি যৌথ আবেদন পাঠালেন— পাখির মতো একজন সুদক্ষ, মহাপণ্ডিতকে অবিলম্বে কোনো রাজপদে অভিষিক্ত করা হোক, দেশ তাতে উপকৃত হবে। সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিরিয়াল অ্যাকাডেমিতে পাখি একটি বড়পদ পেয়ে গেল। হিজ ম্যাজেস্টিজ সার্ভিস। না জানে লিখতে, না জানে পড়তে। ড্রাফট, মেমোরেন্ডাম, আর্টিকল, যা আসে পাখি একবার দেখেই বলে, বাঃ বাঃ, খুব ভাল, তুলনা নেই।

এই কায়দায় বেশ চলছিল। এসে গেল রাজকুমারের জন্মদিন। সবাই সব নানা রকমের উপহার নিয়ে 'হ্যাপি বার্থ ডে' করতে যাচ্ছে। পাখিও রয়েছে সেই দলে। সে অনেক কিছু কিনেছে, সেই সঙ্গে কিনেছে বিশাল বড় একটা স্কোল।

কে একজন জিজ্ঞেস করলে, মহাশয়, এটাও কি উপহার?

—অবশ্যই।

—তা কিছু একটা লিখুন। কিছুই তো লেখেননি। এই সুযোগে আপনার হস্তাক্ষর প্রথম দেখার সৌভাগ্য হবে আমাদের।

—আমার সব ভাল ভাই, কেবল হাতের লেখাটাই তেমন সুবিধের নয়। তুমিই লিখে দাও। রাজকর্মচারীটি মনে মনে বললে, দাঁড়া ব্যাটা,

তোর মজা দেখাচ্ছি। সে বড় বড় করে লিখলে, 'হে রাজকুমার, তোমার কীর্তিকাহিনী আমাদের জানা আছে। পুরাকালের এক উচ্চকাঙ্ক্ষী রাজকুমারের মতো, তুমিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। হে নরাধম তুমি সম্রাটকে হত্যা করে সিংহাসনে বসতে চাইছ। সিংহের আসনে শৃগাল! ধিক ধিক!' পাখি দেখে তার সেই এক পেটেন্ট মন্তব্য করল— বাঃ বাঃ বহুত সুন্দর!

রাজকুমারের ঘরের দোয়ালে স্কোলটা ঝুলে গেল। রাজকুমার লেখাটার দিকে তাকালই না। অন্য সবাই পড়ছে, কিন্তু সাহস করে কেউ কিছু বলছে না। সবাই জানে, বললেই মুণ্ডচ্ছেদ। ও লিখেছে, আর তুমি পড়েছ, দু'জনেরই এক গতি।

লেখাটা ঝুলেই রইল। এদিকে রাজকুমারের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। সার্চ করে তার ঘর থেকে বেরল, সম্রাটের পোশাক আর তরোয়াল। সম্রাট আদেশ দিলেন, সব কটা ষড়যন্ত্রীকে ঝুলিয়ে দাও। যেহেতু পাখি তার পেয়ারের লোক, পাখিরও প্রাণদণ্ড।

তখন এক রাজসভাষদ নতজানু হয়ে সম্রাটকে নিবেদন করলেন— ষড়যন্ত্রের খবর তো পাখিই প্রথম ফাঁস করে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রাজকুমারকে লিখিত ধিক্কারও জানায়। সেই লেখা আজও ঝুলছে। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তিন ধাপ প্রোমোশান। রাজকুমার ঝুলে গেল, পাখি উঠে গেল তিন পদ ওপরে। ভারতের অবস্থার প্রেক্ষিতে গল্পটি মিলিয়ে দেখলে হয়!

শামুক না শঙ্খ

জানলার বাইরে সেই গাছটা যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। সবুজ সবুজ পাতা ছেড়েছে। দূরে প্রতিবেশীর সবেধন নীলমণি আমগাছটি আশামুকুলে ছেয়ে গেছে। কার্নিশে যে কাকটি সাত সকালে এসে তীর্থের কাক হয়ে বসে থাকে সেটিও রয়েছে। পরিবার-পরিজন রোজই যেমন হুড়ুম দুড়ুম করে সেই রকমই করছে। বাইরের পথে রোজকার পিলে চমকানো উৎপাত বজায় রয়েছে। ময়লা ঠেলাগাড়ির ঝনঝন ঝঙ্কার। অটোর ত্র্যাঘ গর্জন। রোজ সকালের বরাদ্দ চা যেমন পাই একটি বিস্কুট সহযোগে তেমনই পেয়েছি। খবরের কাগজ দুম করে যেমন এসে পড়ে তেমনই এসে পড়েছে ডানা ভাঙা পাখির মতো। সেই একই খবর। রেপ, পুড়ে মরা, খুন, দলবাজি, নেতাদের মান, অভিমান, হাঁচি কাশি। কেউ বলছেন, আমি ডানপাশ ফিরেই শুয়ে থাকব, আমি চিৎও হব না, বাঁয়েও ফিরব না। কেউ আবার বিপরীত। ইংরেজি কাগজ হলে বিদেশী মশলা কিছু থাকবেই। ইংল্যান্ডে রাজপরিবারের মেয়েটি ঘোষণা করেছেন, পোশাক আমি আর পরব না। অথবা ইওরোপের এগার বছরের মেয়েরা পটাপট মা হয়ে যাচ্ছে।

কোথাও কোনো অন্যরকম নেই। কেউ মারা যাচ্ছে না। চাকরি চলে যাওয়ার ছাঁটাইপত্র হাতে আসেনি। প্রাণপাখি এখনি খাঁচাছাড়া হবে, এমন কোনো ইঙ্গিতও নেই। সাবান মাখা গালে সাতকামানো ভোঁতা ব্লেড যেমন কসরত করে সেই রকমই করছে। এক টানেতে যেমন তেমন, দুই টানেতে কোনো রকম, তিন টানেতে জ্বালা।

তবু এক একদিন মন কেন এত বিষণ্ণ হয়। কিছুই ভাল লাগে না। মনে হয়, বিষণ্ণ একটি তালগাছের মতো একটি পচা ডোবার ধারে একা খাড়া হয়ে আছি। পার মতো ছ্যাতরান পাতায় রাজ্যের ধুলো আর সাদা সাদা কাককৃত্য। পরিষ্কার কোনো দুর্ভাবনা নয়, একটা আচ্ছন্ন কুয়াশা। আয়নায় পুরনো একটা মুখ, যেটাকে রোজ দেখি, সাবান চড়াই, দাড়ি চাঁছি, টেরি বাগাই। এটা কে? কী করতে

এসেছে? এতকাল কী করেছে? আর কি করবে? কী করতে পারে? ওই মুখটাই অসহ্য। ঠোঁট দুটো চাটুকারিতায় ভরা। স্বার্থহানির ভয়ে সত্যকথা বলতে পারে না। ক্ষমতাশালী, বিক্রমশালী, মানুষের সামনা-সামনি হলে ওই মুখ ঘোড়ার মুখের মতো লম্বা হয়ে যায়। চোখ দুটো শৃগাল ধূর্ত। প্রতিবিম্ব চোখ আসল চোখের দিকে শয়তানের দৃষ্টি মেলে আছে। আমি বীর বলে যেই বীরের মতো চোখ করে তাকাচ্ছি, মনে হচ্ছে, মরার আগে মানুষের চোখ যেমন ছানাবড়া হয়ে যায়, সেই রকম হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রেমিক বলে চোখ দুটোকে যখন মদির করতে চাইছি, তখন মনে হচ্ছে, কাঙালি রাজভোগ দেখেছে। আমি সাধু, বলে যখন তাকাচ্ছি, তখন মনে হচ্ছে টইটম্বুর শয়তানি। আমি বন্ধু, বলে যখন তাকাচ্ছি, তখন মনে হচ্ছে, বহুকালের শত্রু অপলকে চেয়ে আছে। যখনই কিছুই ভাবছি না, তখন শোল মাছের মরা চোখ। পেছনে কী প্রাণের ঝিলিক আছে? না নেই। মরা মানুষ ভুতে পেয়ে ভূতলে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। লোকটার সঞ্চয়ে কিস্যু নেই। স্রেফ ভাঁওতা আর ধাপ্পা! আয়নার ওই মুখটাকে কতকাল আগে পড়া এলিয়টের সেই বিখ্যাত কবিতার কয়েকটা লাইন শোনাতে ইচ্ছে করে :

We ar the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!

তবে ওই অশিক্ষিতটাকে শুনিয়ে কোনো লাভ নেই। সারা জীবন লোকটা মাকুর মতো বাড়ি অফিস, অফিস বাড়ি করে, ষাট বছরের অদৃশ্য একটি জামদানি তৈরি করবে, তারপর অবসরপ্রাপ্ত এক আঁতেল হয়ে পড়ায় জ্ঞান দিয়ে বেড়াবে। প্রত্যেককে শোনাবে, সে একটি টুকরো হীরে। চাঁই থেকে ছিটকে এই পল্লীতে এসে পড়েছে। ছিন্ন সতীদেহ হলে একান্ন পীঠের একটি পীঠ হত। প্রচার হল না বলে প্রাচীরে নাম লেখা হল না। বাঙালি হওয়ার অপরাধে ক্রিকেট টেস্ট খেলার সুযোগ হল না। ছাত্র জীবনে টিমে প্রতিটি বলে ছয়, যেমন টাইমিং তেমনি স্ট্রোক। আই সি এস'টা উঠে গেল, নয় তো কী কাণ্ডই যে হত। ঘুষ নিতে পারলুম না বলে মঞ্জিল হল না। চোর হতে পারলুম না বলে মন্ত্রী হওয়া হল না।

কেউ না কেউ পাশ দিয়ে যেতে যেতে অবশ্যই বলে যাবে, 'এই বুড়ো বাড়ি যা।'

ডাণ্ডা, অথবা পাথর ছুড়ে মারার চেয়েও কঠিন এই বাক্যসমষ্টি। বলা হল, তফাত যাও। যৌবনের পৃথিবী, বৃদ্ধ তোমার স্থান শ্মশানে। ওই দেখ গাছের ডালে অপেক্ষা করে আছে মৃত্যু শকুন। বুড়ো, তুমি তাড়াতাড়ি যাও, আর কোরো না দেরি। ঝামেলা আর বাড়িও না।

আয়নায় যে বিশ্রী মুখটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সেটা আমারই মুখ। যৌবনে বক্তা, বার্ধক্যে শ্রোতা। পাঁচজনের তিক্ত, কটু কথা হজম করতে, করতে কেটে পড়া। কম বয়সে খাদ্য হজমেই সুখ, অধিক বয়সে বাক্য হজমেই সুখ। ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে বৃদ্ধরা ধুঁকতে ধুঁকতে প্রায়শই গিয়ে বলেন, 'যা খাই কিছুই হজম হয় না ভাই! পেট সদা সর্বদাই জয়ঢাক, ভুট ভাট শব্দ।'

ডাক্তারবাবুর তখন প্রশ্ন করা উচিত, 'আপনার কথা হজমের মেশিনারি ঠিক ফাংসান করছে ত! ওটা হজম হলে এটাও হজম হবে।'

নিজেকে তৌলে দেখার চেষ্টা করলেই বিষণ্ণতা বাড়ে। কী রেখে গেলে বাপু! মৃত্যুর পর তোমার অবিচুয়ারিটা নিজেই লেখার চেষ্টা করে দেখ, তখনই বুঝবে, তুমি মাল ছিল না, ছিলে একটি শূন্য ঝুলি। তোমার ভেতর বদ বাতাস ছাড়া কিছুই ছিল না। তিন লাইনেই তোমার কথা শেষ। ঈশ্বরের এক লাথি, দুম করে পড়লে, ট্যাঁ করে কাঁদলে, ব্যা ব্যা, ম্যা ম্যা করতে করতে লায়েক হলে, তিন খাবিতে পটল তুলে ছবি হয়ে ঝুলে গেলে। প্রথমে রজনীগন্ধার বরের-মালা। বিয়ের মরশুমে মরেছিলে। পরের বছর মালার দম চড়া। একমাত্র শ্বশুরের পয়সায় সে মালা পরা যায়। ছেলের পয়সায় একহারা গাঁদার মালা। থার্ড ইয়ারে একটা কাগজের মালা। তারপর! জীবনের আয়ু বছরে মাপা যায়, মৃত্যুর আয়ু অনন্ত। এরপর ঝুলের মালা। তারপর দেয়ালরং। ছবি উতারো। বাবা চলে গেলেন গাদায়। ছেলেও একদিন যাবে বাবার গাদায়। ছেলের ছেলেও যাবে বাবার গাদায়।

গাদা গাদা জীবন্ত বাবা, পার্কে, মন্দির, ধর্মসভায় ফ্যালফ্যালে মুখ নিয়ে বসে আছে। রোলকলের বিপুল খাতা চিত্রগুপ্তের হাতে। ধর্মসভায় বলিষ্ঠ বক্তা মাইক্রোফোনের টুঁটি চেপে ধরে দমকে দমকে ধমক ছাড়ছেন। উঠুন, জাগুন, দপ করে জ্বলে যান, কামনা, বাসনা সব পুড়িয়ে ফেলে মারুন ফুঁ। আমরা সবাই অমৃতের পুত্র।

—তাহলে কথায় কথায় এত ক্যাপসুল, এত ট্যাবলেট খাই কেন ?

—বুঝতে ভুল হচ্ছে। তত্ত্বটা ঠিক ধরতে পারলেন না। জুতো মানে পা নয়। জুতোয় হাফসোল মারে, পায়ে নয়। আত্মার জুতো হল দেহ। দেহে ক্যাপসুল চার্জ করতেই হয়, কারণ ওটা চামড়া। আত্মা হল আমলিন আলো। ফুচকার মতো দেহ খোলে ফুলে থাকে। কামনা-বাসনা হল, তেঁতুলগোলা জল, ইন্দ্রিয়াদি হল গোটা গোটা ছোলা। আর মায়া হল, ফুচকাঅলা। আত্মার ফুচকা ফুটো করে, ইন্দ্রিয়ের ছোলা পুরে, কামনা বাসনার ইমলি কা পানিতে চুবিয়ে পরিবেশন করছে। বিশ্বসংসার অম্বলে মরছে।

—সে না হয় হল ; কিন্তু উত্তিষ্ঠত বললেই তো আর ওঠা যায় না, বাতে হাঁটু আর কোমর দুটোই গেছে, ধপাস করে শুয়ে পড়তে পারলেই ভাল হয়।

—ধ্যুর মশাই, এ জায়গাটাও ধরতে পারেননি। শরীরে নয়, আত্মায় উঠে বসুন।

—মানে, মরে গিয়ে ভূত হয়ে !

ধ্যার ঘোড়ার ডিম ! আত্মা মানে ভূত নয়। ওটা অন্যরকমের জিনিস। রাজভোগ খেয়েছেন। নিরেট গোল।

—অবশ্যই। দশ বছর আগে। সুগার হওয়ার পর আর ছুঁই না, দেখি।

—বেশ, ওতেই হবে। রাজভোগের মাঝখানে ছোট্ট একটা ক্ষীরের গুলি থাকে। আত্মা ওই রকম একটা জিনিস। দেহের মধ্যে আছে। অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ জ্যোতির্ময় একটা শিখা। অনেকটা আক্কেল দাঁতের মতো। মাড়ির তলায় আছে। ঠেলে বেরলে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে।

—তাহলে এবার বাড়ি যাই।

—সে কী, সাতজন শ্রোতার একজন গেলে রইল বাকি ছয়। ধর্ম কথা শোনাব কাকে ?

—কেন ! একালের যুবকদের !

—ধর্ম জিনিসটা প্রবীণদের। জীবনের খাবলা খাবলি শেষ হলে, ক্ষতের মলম।

—লাভ কী ! ক্ষত সারবে ?

—সারবে না। তবে সংসার কী, এসে কী পেলে,আর কী দিলে, সেইটুকু জেনে যাবে। আবিষ্কারের আনন্দ পাবে, বিজ্ঞানীর আনন্দ। দেখতে পাবে, তুমি একটি স্থলচর শামুক বই আর কিছু নও। পেছনে

তাকাও, সারাটা পথ দুপাশে গাছপালা যা পেয়েছ, সবই খেতে খেতে এসেছ, আর গুলি গুলি মলত্যাগ, আর রাশি রাশি ছোট শামুক। তোমার শাঁস বেরিয়ে যাবে একদিন, হড় হড়ে, মেটে মেটে রঙের খোলটা পড়ে থাকবে। ক্রম শুকিয়ে ঠনঠনে হবে, লাথি খেয়ে ছিটকে যাবে, গুঁড়িয়ে যাবে, তোমাকে টপকে খেতে খেতে এগিয়ে যাবে অন্য শামুকের দল। তাদেরও ওই এক পরিণতি।

—এই সব কঠিন তত্ত্ব জেনে কী লাভ!

—যদি শামুক থেকে শাঁখ হতে পার চেষ্টাচরিত্র করে, তাহলে শাঁসটি বেরিয়ে যাওয়ার পর খোলের আদর বাড়বে। দেবালয়ে স্থান পাবে। আরতির শঙ্খ হবে। ফুঁ-ফুঁ-এ বাজবে। মহাশঙ্খ হলে শ্রীকৃষ্ণের ফুঁ-এ সরব হবে স্বর পঞ্চমে। একমাত্র জীবন্ত শঙ্খেই মৃত শঙ্খের মহানির্বাণ তত্ত্বটি লুকিয়ে আছে। শঙ্খই প্রমাণ, জীবনের চেয়ে মৃত্যু মহান, পবিত্র, সরব, উচ্চভেদী। জীবনের শুধু কোলাহল, মৃত্যুর শুধু একটি মাত্র পবিত্র সুর। মন্দিরে মন্দিরে সেই মৃত্যুই বেজে চলেছে ভক্তের ফুৎকারে। তাহলে ভাব, মৃত শামুক হবে, না শঙ্খ হবে। এই ভাবতে বসলেই অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতা আসে। জীবনের মশলা সবই মজুত। ছ্যাঁচড়ার মশলা। বীজঅলা হড়হড়ে পুই শাঁক, ভ্যাসভ্যাসে কুমড়ো, মৃত মাছের আঁশটে গন্ধ, মাথা, সরষে ফোড়ন অবধারিত অম্বল। এত স্বাদ, তবু বিস্বাদ।

মারো টান। নেমে গেল ডান গালের দাড়ি।

—কী রে ব্যাটা মুখ, বড় দার্শনিক হয়েছিস। ঘড়ি দেখেছিস?

—উ রে বাব্বা, নটা।

—ছোটো দৌড়োও। পচাপচ নোট মাসের শেষে। ধরবে না। ধরতে হবে না।

—অবশ্যই। ওইতেই তো চলবে আঠার ঘণ্টা টিভি। ওইতেই তো ঘরে ঘরে জ্বলবে বিদ্যুৎবাতি। চলবে পাম্প। পেয়ালা, পেয়ালা চা। ওর জোরেই তো ঠোঁটে ঠোঁটে চটরপটর বুলি, খিস্তি খেউড়। ওর জোরেই পিঁড়ে, টোপর। শয্যার সোহাগ। কত প্রেম প্রথম প্রথম, দেহবাসনায় লুটোপুটি। ট্যাঁ ফোঁ। অহঙ্কার। মান, অপমান। গোটা গোটা ক্যাপসুল। চির যৌবনের ক্রিম। ফিতে জড়ান মোহব্বতের সঙ্গীত। ওই নোট নেটের মশারিতে, ওই নোট পরিবার পরিজনের পেটে। ওই নোটই অবশেষে কমোডে জলাকারে, দুর্গন্ধী স্থালাকারে। ওই দেখ রোমালি রোটি আর কাবাব, আর

বিরিয়ানি, আর রোল, আর মালাই চমচমের পরিণতি। একশো টাকার আশি টাকাই যে বেরিয়ে গেল বাবা! ব্যাড ইকনমি। আবার না বেরলেও বিপদ, চড়িয়ে দাও ভুসি।

সব শেষ কথাটা বলো না ভাই অত ধানায় পানায় না করে। কেন এই বিষণ্ণতা— প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন তবু কেন...

—কেন প্রাণ কাঁদে? তাই তো? তোমার দুর্ব্যবহারে। প্রাণকে তুমি এতটুকু ভালবাস না, সেই তো তোমার একমাত্র প্রণয়ী, তাই না তার নাম প্রাণ। সে যে তোমায় বারে বারে বলছে—

য্যায়সি সাঁড়শী লৌহকি, ছিন পানি ছিন আগ।
ত্যায়সে সুখ দুখ জগৎ কি, সহজি তু ত্যজি
ভাগ গসহজীবাইণ

সংসার হল লোহার সাঁড়াশি, তুমি হলে লোহা। তোমাকে ধরে এই আগুনে লাল করে তো, এই জলে চোবায়। এরই নাম দুঃখ, সুখ। মুহূর্তের ব্যবধান। সহজী বলছেন, পালা। মনে মনে সব ছেড়ে মনে মনে পালিয়ে আয় প্রাণ প্রণয়ীর কাছে।